

জেলার 'ভূতপূর্ব' গবর্ণমেন্টের উকিল ও বর্তমানে মাননীয় নবাব বাহাদুরের আইন পরামর্শদাতা ধার্মিক চুড়ামণি বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম দৌহিত্র এবং বাল্যকালে সর্বদা তাঁহার নিকট লালিত পালিত হইয়া তাঁহার গুণগুলি অমুকরণ করিতে শিক্ষা করেন। একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অধ্যয়ন শেষ করিয়া, হার হাইনেস সম্ভ্রমের জাঁহা বেগম সাহাব অব মুর্শিদাবাদ সি, আই, (Her Highness Begum Saheb of Murshidabad.) মহোদয়ার কার্যে ত্রুটি হয়েন। উক্ত বেগম সাহেব, এবং তাঁহার জামাতা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ও একমাত্র কর্তা থা বাহাদুর মির্জা সুলতান আলি বেগ মহাশয় গোপেশ্বর বাবুর গুণে ও কার্যে বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন। বেগম সাহেবের একমাত্র বিশ্বাসপাত্র সেক্রেটারী বাবু হেমচন্দ্র রায় গোপেশ্বর বাবুকে একজন আদর্শ কর্মচারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গোপেশ্বর বাবুর নির্লোভতা আমাদের সকলেরই অমুকরণীয়। ইহার নির্লোভ কার্যকলাপ ও সংযত-দ্রিয়তা দেখিয়া ইহার বঙ্গবর্গ ও উর্জ্বতন কর্মচারীগণ পর্যন্ত চমকিত হইতেন। পরোপকার ও মহান্নভাবতা গোপেশ্বর বাবুর হৃদয়ের একটা উচ্চ অঙ্গ ছিল। ইহার শত্রু মিত্র ভেদজ্ঞান ছিল না। যে ব্যক্তি গোপেশ্বর বাবুর বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহাকে ক্রিষ্ট দেখিলে অথবা জানিতে পারিলে সাধ্যমত তাহার কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। শীলতা, ভব্যতা ও ঔদার্য্য বিনয় প্রভৃতি সামাজিক বন্ধনগুলি গোপেশ্বর বাবুর অন্তরে অন্তরে ও মজ্জায় মজ্জায় স্থান পাইয়াছিল। কর্মক্ষেত্রে, সংসারক্ষেত্রে মানবের যে “পঞ্চ ‘ব’” কার বিশেষ প্রয়োজন, সেই পঞ্চ “ব” কার (বিদ্যা, বিনয়, বেশ, বপু ও বাক্য) গোপেশ্বর বাবুতে বর্তমান ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোপেশ্বর বাবুর অজাতশত্রু ছিল, যে ব্যক্তির সহিত ইহার একবার মাত্র পরিচয় হইয়াছে, সেই উহার নিকট মুগ্ধ হইয়াছে।

গোপেশ্বরের সচ্চরিত্রা প্রাত্যেক বালক ও যুবকের একান্ত অমুকরণীয়। একাধারে উপরোক্ত গুণগুলি বর্তমান থাকা আজকালকার যুবকবৃন্দের মধ্যে অতীব বিরল। এই কারণেই অদ্য আমরা এই যুবকের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। পঞ্চবিংশ বয়ঃক্রমে বিগত ১২ই আষাঢ় তারিখে পিতামাতা, ভাই বঙ্গবর্গকে কাদাইয়া ও অকুলসমুদ্রে ডাসাইয়া গোপেশ্বর বাবু অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। গোপেশ্বর বাবু কলিকাতা ওরিয়েন্টাল ক্লাবের ডিরেক্টর ছিলেন ; এবং উহার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। উক্ত ক্লাবের মেম্বরগণ গোপেশ্বর বাবুর দেহত্যাগে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন

এবং তাঁহার আত্মার উন্নতিকল্পে শ্রাদ্ধ দিবসে কাঞ্চালী ভোজন প্রভৃতি সংকার্য্য, শোকসভা ও কয়েকটা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিয়াছেন। দরিদ্রের একমাত্র আশ্রয়দাতা, পরোপকারী ডাক্তার নগেন্দ্র বাবুকে আমরা কি বলিয়া সান্বনা করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গোপেশ্বর বাবুর মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্রকে মাননীয় বেগম সাহেব মহোদয়া গোপেশ্বর বাবুর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিলে ও তৎসঙ্গে শ্রীমান্ প্রবোধ-চন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গুণগুলি আয়ত্ত করিলে উক্ত ডাক্তার বাবুর কথঞ্চিৎ শাস্তি লাভ হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা,—আমাদের আশা পূর্ণ হউক। উপসংহারে আবার বলি যে, ভগবানের বিচিত্র লীলা মানুষের বুঝিয়া উঠা ভার। বিধাতা কি উদ্দেশ্যে এমন রূপগুণসম্পন্ন সর্ব্বশুল্কগণ্যুক্ত অপ্রাকৃতিক কুসুম গোপেশ্বরকে অকালে গ্রহণ করিলেন, মৃত আমরা, কি বুঝিব।

সম্পাদক ।

সিগারেটের আত্মকথা ।

আমার জন্ম সুদূর আমেরিকা খণ্ডে। কিন্তু হুঃখ এই যে, আমার স্বদেশ-বাসীরা আমাকে চিনিলা না। তাই মনের হুঃখে হস্তের সাগর পার হইয়া সুদূর ভারতে আসিয়াছি। এখানে আমার যশের সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে আমার স্মৃনামে দেশ ব্যাপিয়া গিয়াছে। টেনন, হোটেল, মাট, ঘাট, হাট বাজার, যেখানে আমার সন্ধান করিবে, দেখিবে, সেইখানেই আমি বিরাজিত। আমি সর্ব্বব্যাপি! তা বলিয়া আমাকে অনাদি অনন্ত পুরুষ মনে করিও না। আমি নিরাকার নহি, সাকার। আমার কাছে জাতিভেদ নাই। মুচিপাড়া, হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া, সব পাড়াতেই আমার গতিবিধি আছে। আমাকে যে ভক্তিপূর্ব্বক আহ্বান করে, আমি তাহারই গৃহে অধিষ্ঠান হই। সকলকে আমি সমান চক্ষে দেখিয়া থাকি। পণ্ডিত মুর্থ, ধনী দরিদ্র, গোরাল কালা, আমার নিকট সবই সমান।

সকলের নিকট আমার সমান আদর। শিক্ষার্থীরা কখনও আমাকে কাছ ছাড়া করে না। যে যেখানে যায়, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। স্কুলে কলেজে, সভা সমিতিতে, সর্ব্বদাই আমি তাহাদের সঙ্গে ছায়ায় মত অনুগমন করি।

রাখাল বালক পাঁচনি লইয়া গোষ্ঠে বাইবার সময় আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। মুটে মোট বহিবার কালীন আমাকে সঙ্গে রাখে। আমি তাহাদের সঙ্গে সাথী, পিপাসার জল, ক্ষুধার অন্ন। শিক্ষার্থী পাঠ্য্যাসে ক্লান্ত হইলে, রাখাল মার্জিতভাবে তাপিত হইলে, মুটে মোট বহিয়া ক্লান্ত হইলে, আমাকে শ্রমণ করে। আমি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও সহোদর ভ্রাতার জায় তাহাদের মনের অবসাদ দূর করি।

আমরা তিন সহোদর। তিনজনই নিঃস্বার্থপরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আমার বড় দাদা “তামাক” কিছু বয়সে প্রবীণ, কোথাও বাইতে হইলে একেলা বাইতে পারেন না। হাঁকা, কলিকা, টিকে এই তিন তাঁহার সঙ্গে সাথী। এ তিনটিকে ছাড়িয়া তাঁহার একপাও চলিবার যো নাই। তাঁহার আদরও তাই কমিয়া আসিতেছে। আমার মেজদাদা ‘সিগার’ তাঁহার বয়স যে খুব বেশী, তা নয়, তবে অকালে তাঁহার কতকগুলি চুল পাকিয়াছে, দাঁতও দু-একটা পড়িয়াছে। তিনিও একেলা কোথাও যান না, সর্বদাই ‘ছুরি’কে সঙ্গে রাখেন। তাঁহার আদর প্রবীণ মহলেই একটু অধিক। নব্যযুবক দলে আমার পশার একচেটিয়া। আমি কাহাকেও সঙ্গে রাখি না, একেলাই সর্বত্র ভ্রমণ করি।

গত বৎসর ৪৫ কোটী ৯ লক্ষ টাকা আমার অভ্যর্থনার জন্য ভারতে ব্যয় হইয়াছিল। পূর্বে লোকে আমার কদর বুঝিত না, আমার অভ্যর্থনারও একপ বিরাট আয়োজন হইত না। অধুনা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই আমাকে চিনিয়াছে। যে আমাকে একবার আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করি না, চিরকাল তাহার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করি।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা তিন ভাই-ই পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। পরের সুখের জন্য নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সুস্থান কুস্থান সকল স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াই। আমরা শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবেশ দিই, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দিই, বুদ্ধিব্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দিই, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান করি; একথা ভক্তমাঞেই একবাক্যে স্বীকার করেন। যে আমাদেরকে একবার অশ্রয় করিয়াছে, সে আমাদেরকে ছাড়িয়া স্বর্গেও বাইতে চাহে না। আমরা যেখানে বিবাজ্য কবি, সেই স্বর্গ!—সেই নন্দনকানন! গুণ না থাকিলে লোকে এত আদর করে কি? ত্ৰিপুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাসনা ।

আমি,

কল্পনার সনে,
হরষিত মনে,
ভাবিব তব ভাবনা ;
সুহাসিনী আশা
হৃদয়ে পুষিয়া,
ভুলিব সকল যাতনা ।

আমি,

তব মুখ চেয়ে,
বৈঁচে আছি শুধু,
আর ত কিছুই চাব না ।
মাঝে মাঝে শুধু
দেখিব তোমাতে,
দেখা দিতে যেন ভুল না ।

তুমি,

সরল অন্তরে
ভালবেসে মোরে,
করিও না কভু ছলনা ।
বাহু আবরণে
সৌন্দর্য মাখিয়ে,
ভুজঙ্গিনী সম হয়োনা ।

আমার,

তাপিত অন্তরে
দিবাশিখা তুমি,
মল্লিকানীক্লেপে বহিও ।
অভাগ্য প্রতি
না হ'য়ে চঞ্চলা,
স্থিরভাবে সদা রহিও ।

আমি,

জ্যোতিবেশে যদি,
কটু কথা কই,
বিনাক্রেশে তাহা সহিও ।
পর্যাণেতে সদা
পর্যাণ মিশায়ে,
প্রাণে প্রাণে ভালবাসিও ।

আমি,

তইলে তুষিত
চাতকের মত,
প্রেম সুধাধারা ঢালিও ;
আত্মহারা মোর
আঁধার পর্যাণে
পিরীতি-প্রদীপ জালিও ।

তুমি,

মাঝে মাঝে এসে,*
প্রাণ খোলা হাস,
মোহের চমক ভাঙ্গিও ;
মম কণ্ঠে তুমি
পারিজাত হার,
অবিচ্ছিন্নভাবে দ্বলিও ।

আমার,

হৃদি সরোবরে,
হাস্তমুখী তুমি
কমলিনীক্লেপে শোভিও ;
কোমল অন্তরে
সরলতা মেখে,
সুখময় হাসি হাসিও ।

তুমি,
 পূর্ণচন্দ্ররূপে,
 এ হৃদি আকাশে
 জ্যোছনার হাসি ঢালিও,
 বিচ্ছেদ-কালিমা,
 প্রীতি সস্তাষণ
 যতনে সদাই মুছিও ।

তুমি,
 অলক্ষ্যে, আমার
 হৃদয় মাঝারে
 লুকিয়ে লুকিয়ে থাকিও ;
 বিরহ অঁধারে
 ঢাকিলে পরাণ
 মুচকি মুচকি হাসিও ।

আমার,
 তাপিত হৃদয়ে,
 মলয়জাকূপে
 ঞ্চনিত নিতি তুমি আসিও ;
 হতাশ পরাণে
 থাকিয়া থাকিয়া,
 আশার হিলোল তুলিও ।

তোমার,
 সরলতা প্রীতি
 প্রেম উপহার
 আমারই তরে রাখিও ;

মাঝে মাঝে শুধু
 কোকিলের ছলে,
 কণ্ঠ ছলনা খেলিও ।

যদিও,
 তোমায় আমার
 রয়েছি অন্তরে,
 অন্তরে অন্তর তুলিও,
 তুমি আমি এক
 এই ভাব সদা
 অন্তর মাঝারে রাখিও ।

আমি,
 লক্ষ্যদ্রষ্ট হ'লে
 কর্তব্য সাধনে,
 সোহাগের ভরে বলিও ;
 দগধ হৃদয়
 করিতে সাস্থনা,
 শাস্তিবারি সদা সৈঁচিও ।

আমি,
 সংসার-তাড়নে
 এ ভাঙ্গা পরাণে
 পেতেছি কতই যাতনা,
 ভুলি যদি আমি,
 ভুলিও না তুমি,
 অভাগার এই “বাসনা” ।
 শ্রীশরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

বিশেষ দৃষ্টব্য ।—আমরা প্রতি মাসে আলোচনার শেষ ভাগে “কামিনী” উপন্যাস স্বতন্ত্র আকারে কোন মাসে এক ফর্মা, কোন মাসে দুই ফর্মা করিয়া প্রকাশ করিতেছি, গ্রাহকগণ বৎসরের শেষে তাহা স্বতন্ত্র আকারে বাধাইয়া রাখিতে পারিবেন ।

রাজা । এঁা ! ম্যানেজার মুরগী খায় ? কি বল হে ?

নাপিত পারিষদ । হজুর, মুরগীকুল ধ্বংস হ'ল ।

মোসাহেবেরা দেখিল, টোপে মাছ গিলতে দেরি নাই, তখন দ্বিতীয় মোসাহেব বলিল, “হজুর, কেল্লার বাহিরে খায়, তাতে কোন দোষ নাই ।”

যাক্, সভার এই সকল কথাবার্তার পর কিছুদিন যায়,—এদিকে ষড়যন্ত্র সব ঠিক । যাতে ম্যানেজারকে তাড়ান যায়, সকলে নাপিতকে রাজার নিকটে বলবার জন্য ঠিক করিয়া রাখিল । রাজা ম্যানেজারকে ভালবাসে, এতেই আমলাবর্গ মহা ক্ষেপা ।

কেউরি করিবার জন্ত নাপিত হাজির । নাপিত কামাইতে যাইবে, এমন সময় ক্ষুর নীচে রাখিয়া বলিল, “হজুর, আমার একটা কথা আছে ।”

রাজা বলিলেন, “আচ্ছা, বল ?”

নাপিত । হজুর, আমার ভয় হচ্ছে, কেমন করে এই ক্ষুরে আপনার দাঁড়ি কামাই ।

রাজা । কেন, কি হয়েছে ?

নাপিত । হজুর, এই ক্ষুরে খৃষ্টান ম্যানেজারকে কামাই, আপনি হিন্দুরাজা, হিন্দু কুলতিলক মহারাজা, আপনাকে এই ক্ষুর দিয়া কি কামাইতে পারি ? বিশেষতঃ ঐ খৃষ্টান ম্যানেজার যখন মুরগী খায় ।

রাজা । এঁা, এত বড় স্পর্ধা—অমি হিন্দুরাজা—আমার রাজ্যে খৃষ্টান, আর তাকে কেল্লার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না । কোন্ হায় ?

এমন সময়ে একজন দরোয়ান উপস্থিত হইয়া বলিল, “হজুর, কি হকুম ?”

রাজা । ফটক বন্ধ কর ।

দরো । যো হকুম, মহারাজ ।

সেই অবধি রাজবাড়ীর ফটক বন্ধ, ম্যানেজার সাহেব ইহার কিছুই জানেন না । তিনি ভিতরে আসিতে পারেন না । কোন কাজও করিতে পান না, রাজবাড়ীর কোন সংবাদও পান না । তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন । রাজার সঙ্গে দেখা করা পর্য্যন্ত একেবারে বন্ধ । চিঠী লিখিয়া পাঠাইলেন—কোন সংবাদ নাই । শেষে তিনি মহা ক্রোড়ে পড়িলেন । এমন কি, জীবন লইয়া টানাটানি । এক টেলিগ্রাফ করিয়া, তাঁহার বন্ধকে আনাইয়া, তথা হইতে পলায়ন করিয়া, তবে নিস্তার পান । এখন শিরীষ ব্যাটা ত সেই নাপিত-ভাণ্ডারী—ও কি না কবতে পারে ?

কলু বুড়ো কম নন। তার যৌবনের জের এখনও দেখা যায়। আমি বরাবরই ওকে তোংলা দেখছি। তবে কেউ কেউ বলে যে, ওর এক কঠিন ব্যায়রাম হয়েছিল, সেই অবধি ও তোংলা। ওর সাহস খুব। একবার ওর বাড়ীতে ডাকাত পড়ে—তার সাংখ্যায় দশজন ছিল। কলুবুড়ো যে ঘরে ঘুমুত, সেই ঘরে ছজন ঢোকে। বুড় তখন জোয়ান—তখন বয়স কাঁচা—হাতে কিছুই ছিল না। তক্তাপোষের একটা পায়াল ভাঙ্গা ছিল, সেই পায়াল ধসিয়ে ছ-ব্যাটাকে এমন ঘা দিয়াছিল, যে তাহাতেই তাদের ঘাড় কাত হয়। সেইজন্য ত বুড়ো সরকার বাহাদুর থেকে স্বর্ণপদক পায়। এখনও নিজেকে জুয়ান মনে করে।

আর গোপাল খুড় ত বুদ্ধির সাগর। সরকারি খুড়। কি ছোট, কি বড়, পাড়ার সকলেই ওকে খুড়ো বলে, কেহই নারাজ নহে। একজন জেলে মাছ ধরে আস্চে, গোপাল খুড়োকে দেখে সে বলে, “কি খুড়, কোথা যাচ্ছ?”

গোপাল। আমরা “খুড় খুড়” বলিস, চারটা মাছ খেতে দে।

জেলে করে কি, চারটা মাছ দিল। এই রকমে খুড়ের দিন গুজরান হয়। গ্রামের কোন বাড়ীতে ভোজ—খুড়োকে নিমন্ত্রণ হয়নি, তা বলে কি হয়, খুড়ো তথায় হাজির—“সরকারি খুড়ের আবার নিমন্ত্রণ কি?” এই তার মুখের কথা। এই রকম সাত পাঁচ ক্লষ্ক মজুমদার ভাবচে। এমন সময়ে শিরীষ নাপিত বলিল, “মশাই, ভাবচেন কি? আমরা তো আর থাম্চি না। এই চল্লুম; তোমরা এস দেখি একবার, মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করতে পারবো কি না?”

ক্লষ্ক মজুমদার বলে, “আরে, থাম, থাম, আমি যাচ্ছি, গিয়ে দেখ্চি। তাদের সরাতে না পারি, তবে তোরা যা হয় করিস্, তোরা এইখানে বস, আমি একবার দেখে আসি।”

এই কথা বলে তাদের বসিয়ে রেখে ক্লষ্ক মজুমদার দীঘির ধারে গিয়ে বলে, “নবাবু! কি কচেন, ভদ্রলোকের কি এই কাজ? দীঘিতে মেয়েছেলেরা সমস্ত দিন নাবতে পাচ্ছে না, আপনারা বাড়ী গিয়ে মাতলামো করুন।”

নবাবু তখন স্বর্গে কি মর্ত্তে কি পাতালে কিছুই হুঁস্ নাহি,—বলিলেন, “কে বাবা কেটে, তোমার রাধিকা কই? এখন বাবা ক্ষুধিত প্রাণ, ক্ষুধিত করবে এস।” এই কথা বলে ক্লষ্ক মজুমদারকে টানতে লাগলো, ওদিকে নবাবুর বন্ধ গোবর্দ্ধন বাবু তাড়াতাড়ি না উঠে কানে এক কামড়!

কৃষ্ণ মজুমদার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে লাগলো—“বাবারে গেলুম রে, আমার কান কেটে নিলে রে। তোরা কে আছিল, আমায় রক্ষা কর।”

ওদিকে শিরীষ নাপিত, কলু বুড়, গোপাল খুড় ও কার্তিক কৰ্ণকার কান খাড়া করেই ছিল, যেমন কৃষ্ণ মজুমদারের গলার আওয়াজ, অমনি চারিজনের দোড়! আর কে রাখে, গোবর্দ্ধন বাবুকে পরেই দীঘির পাড়ে এনে মার—মার—মার! সেই মার খেতে খেতে বাবুর মদের নেশা ছুটে গেল। তবে স্নুথের বিষয়, তারা এমন ঝাঁচিয়ে মেরেছিল যে, বাবু জখম হননি। কিন্তু দোড়—দোড়—দোড়! উঠিতো পড়ি, ছুটিতে ছুটিতে একেবারে নিজের বাড়ী।

ওদিকে নবাবু বিপদ দেখে একেবার জলে ঝাঁপ। একে মাতাল, তার অগাধ জল, কৃষ্ণ মজুমদার কানের জালায় অস্থির—তা এখন কি করে—নবাবু মারা যান—জলে ঝাঁপ দিয়া পড়লো ও অতিকণ্ঠে নবাবুকে দীঘির পাড়ে তুলে। নবাবু বেহুস, তার পরে শুন্তে পাই, নবাবু মদ ছাড়িয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

সরোজিনী এই দ্বিতীয়বার খণ্ডুরবাড়ী আসিয়াছে। কলিকাতা বোবাজারে তার খণ্ডুরবাড়ী। খণ্ডুর এখন জীবিত, বড় চাকরি করেন, কমিসনার সাহেবের পার্সোনাল আসিষ্ট্যান্ট—বড় চাকরি। তাঁহার হুইটী পুঞ্জ—কেশব ও বিনোদ। কন্যাসন্তান হয় নাই। কাজেই দুই বৌ ঘরের গৃহিণী। শাশুড়ী দুই বৌকে বেশ যত্ন করেন। কোন ক্রটি হবার যো নাই। গৃহে অশান্তির লক্ষণ কিছুই নাই। খণ্ডুর যখন বড় চাকরে, তখন দুই ছেলের চাকরির অভাব কি? তবে কিছু লেখাপড়া শেখা চাই। তাতেও দুই ছেলে কম নয়। বড় ছেলে কেশব তিন বৎসর হলো বি-এ পাশ করেছে এবং বিনোদ এল-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে। ছোট ছেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রত্নপুরে সরোজিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। আর কেশবের বিবাহ হইয়াছে—কৃষ্ণনগরে। কেন, কলিকাতাসহরে কি মেয়ে নাই, যে রামধন বাবু দুই ছেলের বিবাহ অতি দূরে পল্লীগ্রামে দিলেন? ইহার বিশেষ কারণ আছে। তিনি সহরে বাস করেন সত্য, কিন্তু সহরের মেয়েরা একেবারে সভ্য—তিনি

তত সভ্য মেয়ে ভালবাসেন না। তিনি বলিডেন, “আমি যখন পাড়াগাঁয়ে বিবাহ করিয়াছি, তখন আমাদের ছেলের বিবাহ পাড়াগাঁয়ে হওয়াই উচিত। বেশী সভ্য মেয়ে আমার দরকার নাই। তবে যারা কলিকাতায় ছেলের বিবাহ দেয় দিগ, তাতে আমার আপত্তি নাই।” বিশেষতঃ, তাঁর স্ত্রী স্নকেশিনীর তো পাড়াগাঁ থেকে মেয়ে আনিবার ভারী ইচ্ছা।

একবার স্বামী স্ত্রীতে কথপোকথন হয়,—তখন ছেলে দুইটির বিবাহ হয় নাই—কেবল ঘটকালি চলিতেছিল।

গিন্নি। দেখ, কেশব বড় হয়ে উঠেছে, যেটের কোলে কুড়িতে পা দিয়াছে, আবার ওদিকে এল-এ, পাশ করিয়াছে, এখন বিয়ের জোগাড় করা বাক্য।

কর্তা। আমিও ত ভাবছিলাম, যে কি করবো, ঘটকেরা ত একেবারে ছিঁড়ে থাকে।

গিন্নি। সহরে আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা নাই। আমি যেমন, আমার বৌটিও তেমনি হয়—এই ইচ্ছা। আমি নিজে যখন পাড়াগাঁয়ে মেয়ে, তখন পাড়াগাঁয়ে মেয়ে আনাই ভাল। তুমি কি বল ?

কর্তা। আমার মত কি আর পৃথক ? তুমি যা বলবে, আমারও ইচ্ছা তাই।

গিন্নি। না, তুমি বুঝে দেখ, সহরের মেয়েরা তত লাজুক নয়, মাথায় কাপড় দেয় না, আর হাম্ বড—শেষে কি আমি বিপদে পড়বো। শেষে শাশুড়ী বোয়ে গলাবাজি করতে হবে—বুড়ো বয়সে বোয়ের গল্পনা সহিতে হবে ?

কর্তা। না, না, যাতে সকল দিক্ বজায় থাকে, আমি তাই করবো। কৃষ্ণনগরে যে মেয়েটি দেখে এসেছি, কেশবের সেইখানে বিবাহ দিব। মেয়েটিও ভাল, ঘরও ভাল—অবস্থাও মন্দ নয়। তাতে কেশবের আপত্তি হবে না।

গিন্নি। আর আমার কোনও আপত্তি নাই। মেয়েটি দেখতে স্ত্রী হলেই হলো, তারপর তাকে গড়েপিঠে নেওয়া, সেতো আমার হাত।

কর্তা। তাতে তুমি বেশ পটু। বশীভূত কেমন করে করতে হয়, তা তুমি বেশ জান, আমার মত বুড়কে যখন বশ করতে পেরেছ, তখন তুমি বরের বোকে বশীভূত করে রাখবে, এক সামান্য কথা।

গিন্নি । নাও তোমার আর খোসাবুদী কথা বলতে হবে না, আমি তা শুনবার জন্যে ব্যগ্র হইনি । তুমি কেঠনগরের সেই মেয়েটাকে ঠিক কর, তা হলেই খুব হলো ।

কর্তা । খুব হলো আর কি ? আমি তোমার কি উপকার করতে পারি । তুমি আমার জন্যে যে সকল কাজ করেছ, তার তিল মাত্র শোধ দিতে পারিনি । মায় জুতা ঝাড়া থেকে ইস্তক ক্যাসবাক্সের চাবিটা পর্য্যন্ত তোমার একতার, কখন আমায় ভাবতে হয় না, দেখতে হয় না । দেখ, সংসারের ঝক্কি সব তোমার উপর, তুমিই সব দেখছ, সব করছো, ছেলেদের লেথাপড়া শেখান—তাও তোমার হাত, আমার খাদ্যের আয়োজন, ঝি-টীদের ভালমন্দ দেখা, এ সব তোমার হাত, আমি কেবল তিনশো টাকা মাসে মাসে দিয়ে খালাস—সব তোমার করতে হয় । আমাকে সংসারের ভাবনা চিন্তা কিছুই ভাবতে হয় না ।

গিন্নি । যাক্, এখন তোমার লেকচার শুনতে আসিনি—আমার অনেক কাজ আছে ।

ঠিক এই সময়ে এক ঘটক আসিয়া ডাকাডাকি করায় কর্তা আর গিন্নির তোঁবামোদ করিতে পারিলেন না, এক প্রকার বিমর্ষ হইয়াই বৈঠকখানায় বাইতে বাধ্য হইলেন । “আমুন, আমুন” বলিয়া ঘটককে আহ্বান করিলেন ।

এদিকে ছোট বৌ সরোজিনী দ্বিতীয়বার খুত্তরবাড়ী আসিয়াছে । খুত্তরের কোন অভাব নাই । ছোটবাবু বিনোদ মূহ্ মূহ্ হাসিতেছে । তায় আবার এল-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে । তবে তার জুয়শ খুব—এদিকেও বিয়ে ওদিকেও বি-এ—বাস্তবিক বি-য়ে এই শব্দে হিন্দু বাড়ীর কি ছেলে কি মেয়ে সকলেরই কেমন একটা আনন্দ হয় । কোন একটা ছেলে বা মেয়ের সখ্য হইতেছে, তখন তার যে কত আনন্দ তা কেবল সেই মেয়ে বা ছেলেই ব্যাখ্যা করতে পারে । মন কেমন প্রফুল্ল, মুখে সদাই মূহ্ মূহ্ হাসি—মন কেমন কেমন করে—কি যেন কি চায় । সে এক সময়, আবার যখন বিয়ে হইবে গেল, তখন আর এক সময় ; তবে সকল বিবাহতেই যে সমান জুয়, তা বলা যায় না ।

কিন্তু বিনোদের সহিত সরোজিনীর বিবাহে কোন বিয় বা অশান্তির উদয় হয় নাই । বিনোদের খুত্তর শাশুড়ী যদিও সহরবাসী নহেন, তজ্জাচ ভক্ত ও সন্ন্যাস্ত । তাতে তাদের সরোজিনী একটামাত্র মেয়ে । কাজেই বিনোদের

মন-ভার হবার কারণ নাই; তবে সহরে ছেলে ব'লে প্রথম প্রথম যা কিছু একটু মন ভার হয়েছিল। বিনোদের ইচ্ছা—দার সঙ্গে তার বিয়ে হবে—তার লেখাপড়া জ্ঞান থাকা চাই—হাব ভাব—কটাক্ষ সব চাই—চেয়ারে বসা চাই; ফুটবল চাই—দোলার বিধি সেজে পশম বোনা নাই। কাজেই পাড়ারগোয়ে মেয়ের উপর মন সহজে উঠে নাই। তবে এই সময়ে সরকারদের বাড়ী এক বিষম কাণ্ড হয়—সেই অবধি আর রঙ্গিনী রসতরঙ্গিনী কলিকাতা বিহারিণীর প্রতি তাহার মন একেবারে দমিয়া গেল। তখন “সরোজিনী রাখ পায়, রাখ তোমার রাঙ্গাপায়” হইয়া দাঁড়াইয়া।

সরকারদের বাড়ী রামধন বাবুর বাড়ীর লাগাও। ছুইটাই দ্বিতল বাড়ী। এ ছাত দিয়া ও ছাতে যাওয়া যায়। সরকার মশাই প্রাচীন লোক। গৃহে কেবল একমাত্র ছেলে দ্বিজেন্দ্র ও একমাত্র বৌ আদরিণী। সরকার মশায়ের বাড়ী প্রায় সর্বদাই সরগরম। বোমা সদাই পক্কে চড়ে আছেন—ঋগুর বা স্বামীর কথা কানে ওঠে না। তিনি যা কর্কেন তাই—তা ভালই হক আর মন্দই হক। আদরিণীর বাপের বাড়ী কলিকাতায় এবং ঋগুর বাড়ীও কলিকাতায়—কাজেই তাঁর অভিমান অধিক হইবারই কথা। এদিকে ঋগুর ও স্বামী বেচারী প্রাণপণে মন যোগাইতেছেন—কিন্তু আদরিণী গরবিনী। তাঁর মন কিসে সন্তুষ্ট হবে—তা উভয়ে খুঁজে পান না। এইজন্য উভয়ে দুঃখিত—ওদিকে আদরিণী রুষ্ট—তায় আবার আদরিণী নব্যভাবে শিক্ষিতা—বেথুন কালেক্সের ছাত্রী। যখন বাপের বাড়ী থাকিতেন, তখন প্রত্যহ বেলা দশটার সময়ে এক গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইত, আদরিণী অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বেথুন স্কুলে পড়িতে যাইতেন। আবার যেমন চারিটা বাজিত, অমনই গাড়ী আসিয়া বাড়ীর ফটকে লাগিত—আদরিণী পড়িয়া আসিতেন। এই প্রকারে আদরিণী ছ' মাস পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষায় কালাতিপাত করেন। তারপর বিবাহ—তারপর ঋগুরবাড়ী অমরাপুরীতে বাস; কিন্তু আদরিণীর মন কিছুতেই ওঠে না। একে কালেক্সে পড়া মেয়ে—তায় বাপমার আছরে মেয়ে—নামও আদরিণী,—স্বামী বড় রোজগারে নয়। কেবল তিন কুড়ি টাকা মাসিক সম্বল। আদরিণীর বিবাহ হবার পূর্বে পাড়ার রঙ্গিনী সঙ্গিনীরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “তাই আদর! কেমন বর, পছন্দ হয়?”

আদর। তোর কেমন বর, পছন্দ হয়, তা বল, তারপর আমি বলছি।

রঞ্জিণী। আমার যদি কোন জমিদারের বাড়ী বিয়ে হয়, তবে আমি বড় খুসী হব।

আ।—আমি, ভাই, পাড়ারগে যেতে চাই না, পাড়ারগে পেত্নী হয়ে মরব কি? আমি কলকতায় থাকতে চাই। বরের বাপ খুব বড়-লোক হবেন। বর চারি পাঁচ শত টাকা রোজগার করবে, আমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবো, কোন কাজকর্ম করতে হবে না। বর আমার তোষামোদ করবে। রোজ রোজ নতুন নতুন আমোদ করবো।

র। তা, তুই যেমন ঘরের মেয়ে, তোর অমনধারা বর না জুটলে শোভা পাবে কেন?

সেই আদরিণী এখন এই সরকার মশাইয়ের ঘর উজ্জল করতে এসেছেন। কাজেই কিছুতে মন উঠে না। শাশুরী নাই যে, সংসারে জ্ঞান পাই-বার আশা থাকবে, তা সে আশাও নাই। সরকার মশাই প্রাচীন হই-য়াছেন, জীবিয়োগের পরে আর নতুন সংসার পাড়েন নাই। পাড়ার লোক বলিত, “মশাই, আপনার বয়স কতই হয়েছে যে, দ্বিতীয়বার পরিণয় করিবেন না? কেবল গোঁপ জোড়াঁটাই সাদা হয়েছে, মাথার চুলে তো সাদা রং ধরে নাই। তবে কেন বিবাহ করবেন না?”

সরকার মশাই তত্বতরে বলিতেন, “না, আর ও আলীকাদে কাজ নাই, এখন দ্বিজেন বেঁচে থাক, তোমরা পাঁচজনে তাকে আলীকাদ কর, আর বোমা ঘরে এসেচেন, তাদের রেখে আমি মরতে পাঞ্জাই বাঁচি।”

কাজেই সরকার মশাই আর দ্বিতীয় সংসার করেন নাই। যাতে দ্বিজেন ও বোমা স্থখে থাকেন, ও নাতি নাত্নীর মুখ দেখেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু বোমার কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি একেবারে অবাক! বোমা খন্তরকে দেখতে পায়েন না। তাঁর কথা শুনে ন। এমন কি, খাণ্ড-দ্রব্য পরিষ্কার করিয়া দেওয়া তা কিছুই নাই। বোমা কেবল বসিয়া বসিয়া পশম শেলাই করবেন; আর সরকার মশাইয়ের ঘরে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাক, তাহাতে বোমার কিছুই আসে যায় না।

কেনার মা বাড়ীর কি, সেতো সর্বদাই বোমার ভয়ে ত্রাসিতা; কি হইবে—কি করিবে—কিছুই ভাবিয়া ঠিক পায় না। বোমা বলিলেন, “ঝি, সাত আনার সবুজ পশম এনে দাও,” আবার তৎক্ষণাৎ আর এক

হকুম—“না না, সবুজ পশম নয়, নীল পশম এনে দাও।” ঝি সেকলে লোক, তাতে আবার কালা—কানে কম শুনে, হয় ত পশম শুনিতে পটম শুনিল। কোন কথা বোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, বাজারে গিয়া “পটম আছে, পটম আছে” বলিয়া এ-দোকান সে-দোকান! কোন দোকানে পটম পায় না। আবার দোকানদারও বুঝিতে পারে না। কি করে, ঝি বেচারি ফিরিয়া গিয়া বলিল, “পটম পাওয়া গেল না।” আর যায় কোথা? আর কি বিশ্বের রক্ষা আছে। কার সাধ্য রোধ করে। কার সাধ্য অগ্রসর হয়। খণ্ডর ও স্বামী উভয়ে জড়সড়। সাহস করিয়া কেউ কিছু বলিতে পারে না। বড়বরের মেয়ে। তাতে আবার “বিজ্ঞাবতী।” সরকার মশাইয়ের বাড়ী প্রায় একটা না একটা কাণ্ড লেগেই আছে। এক ব্রাহ্মণকন্ডা রাধুনী আছে। তার প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদিতে রসনা তৃপ্তি হয় না। কোন না কোন দিন খোলে হুন হয়নি, টেকে অঞ্চল হয়নি। এই সব নিয়ে রাধুনীর সঙ্গে কলহ—মোটের উপর তাহার কাছে কাহারও নিস্তার নাই—কাহাকেও না কাহাকেও—বোমার হাড়িকাটে পা দিতেই হবে।

প্রত্যহ বিনোদ এই সকল ঘটনা শুনিতে পায়। যখন তার বিবাহ হয়, তার পূর্বে হইতেই কিছু কিছু স্তর, তারপর যত দিন ঘাইতে লাগিল, সরকার মশাইয়ের বোমার থিচুনি ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বিনোদের মনের পুরাতন ভাব তিরোহিত হয় এবং তাহার স্ত্রী সরোজিনী বাহাতে স্বামী-সোহাগিনী হইয়া থাকিতে পারে, সরকারদের বোয়ের বাতাস না লাগে, তাহারই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। সরোজিনী রত্নপুরে পড়িতে শিখে নাই। কেন না, তথায় কোন বালিকা বিদ্যাগয় নাই। তবে খণ্ডরবাড়ী বিনোদ স্বয়ং কিছু কিছু গড়াইতে শিখাইয়াছে। তাহাতে সরোজিনী লিখিতে ও পড়িতে শিখে। অন্যদিকে সরোজিনী শাশুরী ঠাকুরাণীর স্বত্ব রক্ষণ প্রভৃতি কার্যে বেশ পটু হইয়া উঠিল।

সরোজিনী প্রত্যহ উঠিয়া দেখিত যে, শাশুড়ী ঠাকুরণ স্বয়ং রত্নশালা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। তিনি বলিতেন, “বোমা! আমি যতদিন পারি, ততদিন রত্নশালা নিজেই পরিষ্কার ও পরিপাটী করিয়া রাখি, তারপর যখন আমি বুড়ী শোনের ছড়ি হ’ব, তখন তোমরা আসিয়া আপন আপন কাজ বুঝিয়া পরিয়া লইবে।” রত্নন আরম্ভ হইবার পূর্বে রাধুনীকে কোন্ জিনিষ কোথায় রাখিতে হইবে, এবং প্রত্যেক জিনিষ বাহাতে অপরিষ্কার-

স্থানে বা অপরিষ্কার ভাবে না থাকে, তাহা তিনি দেখাইয়া দিতেন।
 ঝি যখন তরকারি কুটিতে বসিত, তখন তিনি বঁটিখানি পর্য্যন্ত দেখিতেন,
 তাহাতে কোন ময়লা আছে কি না, ও তাহা পরিষ্কাররূপে ধোওয়া
 হইয়াছে কি না? সেইজন্য স্নেহদা নামে বাড়ীতে ঘে ঝি ছিল, সে বড়ই
 বেজার হইত ও আপন মনে বকিতে থাকিত—“এমন গিন্নিও তো দেখিনি,
 বঁটিতে কিছু লাগিয়া আছে কি না, তাহাও তিনি খানা তল্লাসি করেন!
 আমি কি চোর যে, বঁটিতে কোন জিনিস লাগাইয়া রাখিব। বঁটিতে রোজ
 রোজ তরিতরকারি কুটিলেই ময়লা হবে, তা রোজ রোজ কে পরিষ্কার
 করে? উমেশের মা কালিবাবু বাড়ী কাজ করে, আহা! কেমন স্নেহে
 আছে, যেন বাড়ীর গিন্নি, ঝি বলে কার সাধি! আর আমি দশ বার
 বছর বাবুর বাড়ী কাটালেম, যে কে সেই। তবে কি না, দেয় খোর
 ভাল। বকাবকি ঝকাঝকি নাই। তা বলে রোজ রোজ বঁটি সাক্ষ কর্ত্তে
 পারি না।”

গিন্নি ঝিয়ের কোন কথা শুনিলে, কখন বিরক্ত হইতেন না। তিনি
 মিষ্টকথায় তাহার মন এমন ভিজাইয়া দিতেন যে, ঝি একেবারে গলে
 যেত। শেষে হয় ত একখানা কাপড়, না হয় আটগুণ্ডা পয়সা, জল খেতে
 দিতেন। তখন ঝিয়ের মনে প্রফুল্লভাব দেখা যাইত।

গিন্নি ও ছই বৌয়ের পাওয়া দাওয়ার পর বড়-বোমা পান সাজিতেছেন
 ও ছোট বোমা সূপারি কুচাইতেছেন, এমন সময়ে শ্রামা নাস্তিনী, কামা-
 ইতে—পায়ে আলতা পরাইতে, উপস্থিত হইল; সে পান সাজার ঘট
 দেখিয়া বলিল,—

“পান তো চিরি চিরি,

সূপারি তো বাহাছরি॥”

“এখন কি বোমারা কামাবেন? না, আর ছ-ঘর কামিয়ে আসবো?”

বড়বো। শ্রামার যে আর বিলম্ব নয় না, কেন—তোর ভারী তড়ি-
 তাড়ি দেখছি যে? ব্যাপারখানা কি, বল দিকিন্?

গিন্নিও তাহাতে যোগ দিয়া বলিলেন, “তোর কি কোথাও কাজ
 আছে? আমার বাড়ী এলেই তোর ভারী বাড়াবাড়ি হয় দেখছি? ঐ
 পিড়িতে বোস, বোমাদের ভাল ক’রে কামিয়ে দিবে যা। তারপর যেথা
 ইচ্ছা সেথা যাস।”

শ্রামা বলিল,—

“আমার আশ্রিতা পায়ে দিলে ।

বাহার দেখায় কেবল মলে ॥

যখন মলের শব্দ হয় ঝন্ ঝন্ ॥

তখন তাদের গা করে ছন্ ছন্ ॥

রান্না পায়ে মলের বাহার ।

দেখে শুনে পুরুষ মানে হার ॥”

“বৌঠাকরুণ, আপনারা আমার মাথার মণি, আপনাদের আশ্রিতা না পরিয়ে কি কোথাও যেতে পারি? তবে শিব্বাবুর বোয়ের সহি এসেছে, আমার বাড়ীতে তিনবার ঝি পাঠিয়ে দিয়েছিল; তাই ভাবলেম, তবে তাড়াতাড়ি শিব্বাবুর বোয়ের সহিকে একবার কামিয়ে দিয়ে আসি। তা, আপনাদের ছেড়ে কি আমি যেতে পারি।”

ছোট-বো। শ্রামা! বল দিকিন্, আমাকে ক’দিন হলো কামিয়ে দিস্ নি? তোকে ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না। তাক্ দিকিন্, আমার পুয়ের নোখগুলো কত বড় হয়েছে?

বড়-বো। ওর এখন অনেক যজমান হয়েছে, এখন আমাদের ভুলে যাবে। আর কি আমাদের মনে থাকবে?

শ্রামা। বৌঠাকরুণ! অমন কথা বলবেন না, আপনারা আমার যজমান, আপনাদের ফেলে কি আর কারও বাড়ী যেতে পারি?

বড়-বো। তোকে আজকাল ডেকে পাঠালে আসিস্ না কেন? ঘরে ঘুমুস্ না কি?

শ্রামা। বৌঠাকরুণ! আপনি তো জানেন, আমি পাঁচ কাজের জেলক, পাঁচজন আমায় শ্রীচরণে রাখেন ব’লে আমায় পাঁচজনের মন যোগাতে হয়। তা না হলে আমার কেমন করে চলবে? বাড়ীতে কেবল পোড়া পেটের জন্তে থাকি। তারপর পাঁচজনের বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়াই। বাড়ীতে হদ্দ ছুঁটা থাকি, তারপর যদি কেউ যায়, তবে আমায় কেমন করে খুঁজে পাবে?

ছোট-বো। তুই আমাদের বাড়ী থাক্ না? আমি তোকে বড় ভাল-বাসি। তুই যদি আমার সঙ্গে আমার বাপের বাড়ী যাস, তবে খুব ভাল হয়।

বড়-বৌ। সে কথা মিছে নয়, —তাকে পেলে কত যত্ন ক’রে রাখি।
তাকে ডেকে ডেকে পাই না, তখন চল্লিশ ঘণ্টা হাজির থাক্‌বি।

এমন সময়ে শিববাবুর বাড়ী হইতে ঝি উপস্থিত হইয়া বলিল,—“হ্যাঁ
বোঁঠাকরুণ! এখানে কি শ্রামাদিদি এসেছে? দিদি বাবু ভারি ব্যস্ত
হয়েছেন, তাঁর সহী এসেছেন, তাঁকে কামাতে হবে।

বড়-বৌ। ঝি! তুই উপরে আয়, শ্রামা আমাদের কামাবে, কামান
হ’লে তুই সঙ্গে করে নিয়ে যাস্; কি জানি, আবার যদি অগ্ন জার-
গায় যায়।

ঝি। (শ্রামাকে দেখিয়া) বলি, ও শ্রামা দিদি! তোকে দু-তিন দিন
থেকে ডাকাডাকি কর্‌চি, তুই থাকিস্ কোথা?

শ্রামা। আর বোন, কোথা থাক্‌বো। তোমাদের আঁস্তাকুড়ে, আঁদারে
পাঁদারে পোড়ে থাকি।

বড়-বৌ। পিসীমার সহী কবে এল? আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসতে
নেই কি?

ঝি। দিদিবাবু বলছিলেন, কাল সহীকে নিয়ে আপনাদের বাড়ী বেড়াতে
আসবেন। আমি গিয়ে আবার বলিগে; তা হ’লে কাল নিশ্চয় আসবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

কামিনীর বিবাহের সময়ে ভারী এক গোলমাল উপস্থিত হয়। বিবাহের
সমস্তই ঠিক। কৃষ্ণ মজুমদার গলগলকৃতবাসে অভ্যর্থনা করিতেছেন। বরযাত্রী
ও কস্তাযাত্রী মহোদয়গণ ক্রমশঃ উপস্থিত হইতেছেন। বিবাহসভা জমকিয়া
উঠিয়াছে। চারিদিকে ছড়োছড়ি, তাড়াতাড়ি। বর আসিয়া বিবাহ-সজ্জার
উপবেশন করিল,—অন্তঃপুরে হলুধনি পড়িল।

ছেলেদের মধ্যে নানাপ্রকার ছড়া কাটাঁকাটি হচে, মাঝে মাঝে
বৃদ্ধেরাও তাতে যোগ দিচ্ছেন। দুই দল।—বরযাত্রী একদল ও কস্তাযাত্রী
একদল। বরযাত্রীর প্রথম বালক বলিল, “মাছা, বল দেখি,—

“বাঙ্গালার মানুষ নাকি,
ইংরাজিতে জলপাত্র,
এমন কি আছে এ মহীতলে,
বুদ্ধিমান থাক যদি বল সকলে ॥

কন্যাযাত্রীর প্রথম বালক ।—উঃ! কি ছড়াই বজেন, ওর উত্তর তো
আমার মুখত—ওর উত্তর শুন্বি তো শোন,—

“মগ—ব্রহ্মদেশীয় লোক । ইংরাজিতে “মগ” অর্থে একরূপ জলপাত্র ।”

কন্যাযাত্রীর ২য় বালক ।—আমরা একটা প্রশ্ন করি, তোমরা উত্তর কর ।

“যুধিষ্ঠিরস্বা বা কন্যা নকুলেন বিবাহিতা ।

পূজিতা সহদেবেন সা কন্যা বরদা ভব ॥”

“অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের কন্যা যাহার সহিত নকুলের বিবাহ হইয়াছে, এবং
যিনি সহদেব কর্তৃক পূজিতা হইতেছেন, তিনি বরদান করুন । এ কন্যা কে ?”

বরযাত্রীর বালকেরা কেহই উত্তর করিতে পারিল না । এমন সময়ে
বরযাত্রীর এক বৃদ্ধ বলিলেন, “ওরে বাপু, এর উত্তর দিবার ছেলে ছোকরার
কর্ম্ম নয় । এর উত্তর আমার কাছে শোন্ ।—

“যুধিষ্ঠির অর্থে পর্বত, তাহার কন্যা অর্থাৎ পার্বতী । নকুল অর্থাৎ
ন—কুল অর্থে শিব ব্রহ্মায় । এখন অর্থ শোন,—শিবের সহিত যে পার্বতীর
বিবাহ হইয়াছে এবং যিনি সকল দেবতা কর্তৃক পূজিত, তিনিই বরদান করুন ।”

“বুঝ্লে, এর অর্থ কি বুঝ্লে ? এঁ্যা ?” মুকুন্ডস্বামী ধরণে সেই বৃদ্ধ
উত্তর করিলেন ।

কন্যাযাত্রীর ৩য় বালক বলিল, “আপনাদের কোন ছেলেতে তো উত্তর
করিতে পারিল না ।”

কন্যাযাত্রীর তৃতীয় বালক বরযাত্রীর বালকদিগকে সন্ধান করিয়া
বলিল, “যখন তোমরা হেরে গেলে, তখন আমাদের আর একটি প্রশ্নের
উত্তর দাও, যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, তবে তোমরা প্রশ্ন
করিলে আমরা উত্তর দিব । প্রশ্ন শোন,—

“বহুমূল্য বটে আমি টাকাত্তে না পাও ।

সর্বস্থানে আছি যথা তথা তুমি চাও ॥

সকলের অধিকার সমান আমাতে ।

ধনী বা দরিদ্র আমি সবার্কার হাতে ।

আমার মহিমা যেবা বুঝিবারে পারে ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিতে পারি তারে ॥
 বুঝিতে না পারে যেবা শত্রু হই তার ।
 জীবন কাড়িয়া লই করহ বিচার ॥
 বলহ পাঠক আমি কেবা হেন জন ।
 মোরে না চিনিয়া কর ঘোর বিড়ম্বন ॥”

বরষাত্রীর চতুর্থ বালক উত্তর দিল, “সময়।” তখন সে বলিল, “আমার
 প্রশ্ন শুন,—আমাদের দেশের কুড়িটা প্রবাদ বাক্য বল ?”

কজ্জাষাত্রীর বালক।—ও প্রশ্ন হ’ল না ।

* বরষাত্রীর বালক।—কেন হ’ল না ?

মহা গোলমাল পড়িয়া গেল । শেষে কজ্জাষাত্রীর এক যুবক বলিল, “আমি
 ঐ প্রশ্নের উত্তর করছি, কেবল কুড়িটা প্রবাদ বাক্য বৈ ত নয় ? আচ্ছা,
 শোন,—

১। পরের সোনা দিও না কাণে, প্রাণ যাবে হেঁচকা টানে ।

২। মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, সেই ত বিষম ক্ষুর ।

৩। ঘর জামায়ের পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ ।

এমন সময়ে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, “ওরে বিয়ের সভায় ও
 কথা বলতে নেই।”

৪। পেটে খিদে মুখে লাজ, সে কুটুমে নাহি কাজ ।

৫। হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই ।

৬। দয়ার চেয়ে ধর্ম নেই, হিংসার চেয়ে পাপ নেই ।

৭। যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম ।

৮। অতি ছোট হরোনা ছাগলে মাড়াবে ।

অতি বড় হরোনা ঝড়ে প’ড়ে যাবে ॥

৯। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ।

১০। হাকিম ফেরে ভো ভকুম ফেরে না ।

১১। সবুরে যেওয়া কলে ।

১২। গায়ের কালি খুলে যার, মনের কালি মলে যার ।

১৩। যার নুন খাই, তার গুণ গাই ।

১৪। ধরি যাছ না ছুঁই পানি ।

১৫। বেল পাকলে কাকের কি ?

১৬। ঘুবু দেখেছ—ফাঁদ দেখনি।

১৭। কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে।

১৮। জোর যার মুল্লুক তার।

১৯। যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।

২০। কপালে নাইকো ঘী, ঠক্কাকালে হবে কি।

“কেমন হয়েছে ?”

সকলে বলিয়া উঠিল, “সাবাস, সাবাস।”

এইরূপ আমোদ প্রমোদ চলিতেছে, এমন সময়ে বিবাহ-সভায় এক বিষম বিপদ উপস্থিত হইল।

শুভকার্য্যে বিপদ প্রায়ই ঘটয়া থাকে। পরিণয়ে বিপদ ঘটবে তা আর আশ্চর্য্য কি ?

বরের বাপ রামতারণ ঘোষাল বলিলেন, “টাকাকড়ি দেবার যে বন্দোবস্ত হয়েছে, তা সমস্ত মিটিয়ে না দিলে আমি বরকে সভা থেকে তুলে নিয়ে যেতে দিব না।”

বরপক্ষের এক ব্যক্তি বলিল, “তাতো বটেই, টাকা কড়ির হিসাব আগে হয়ে যাক, তার পর বিবাহ হবে।”

কন্যাপক্ষের একজন বলিল, “মশাই! লগ্ন যে বয়ে যার, এখন বিবাদ রেখে দিন।”

রাম। কেন, চোরের দায়ে ধরা পড়েছি না কি যে, টাকা দিবে ব’লে এখনো দিচ্চ না ? একি গরজে বিয়ে না কি ? অমনি বিয়ে হলেই হলো ! তা হবে না। ঘোষাল শর্মা তেমন নন। টাকা আন, সব টাকা চুকিয়ে দাও, তবে ছেলের বিবাহ দিব।

নবাবু। এ কেমন কথা ! টাকা কড়ির বন্দোবস্ত আছে সভ্য, তা ব’লে কি বিবাহ-সভায় আপনি বরের বাপ হয়ে এমন ক’রে কলহ তুলে দিচ্ছে ভাল করছেন ?

রাম। মশাই ! আপনি তো খুব ভাল বুঝলেন, দেখছি ? এখন যদি টাকা না লইব, তবে বিবাহ হয়ে গেলে কি টাকা পাব ? কেন, ছেলে কি পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিল না কি ? তাই ছেলের বিবাহ না দিলে আর ছেলের বিবাহ হবে না ? চল, হরবিলাস, আমি তোমার বিবাহ অন্যত্র

দিব। কোন্ ব্যাটা আর এখানে বিবাহ দেয় দেখি। আমি তো ছেলে নিয়ে উঠলুম। দেখি, কেমন ক'রে বিবাহ দেয়।

নবাব। ও ঘোবাল মশাই! অত রাগ করেন কেন? আপনি ভেবে চিন্তে দেখুন, কতাকর্তাকে কি বিপদে ফেলেছেন। তার টাকা কড়ির অবস্থা তো জানা আছে। আপনি জমি জমা লন, উনি দিতে প্রস্তুত আছেন। আর উনি বরকে দেবেন, নিজের মেয়ে স্ত্রী থাকাবে, তাহে কি অস্বাভাবিক আছেন? টাকা কড়ি ছাড়া যা চান, উনি আপনাকে তাই দিতে স্বীকার আছেন। কেমন মজুমদার মশাই! আপনার কি কিছু আপত্তি আছে?

কৃষ্ণ মজুমদার। আপনারা যা বলবেন, আমি তাতেই রাজি আছি।

রাম। না মশাই, তা হবে না। টাকা চাই। দুই হাজার টাকা পাইয়াছি। তিন হাজার নগদ দিবার কথা। এখনও এক হাজার বাকী। আমি ওসব কথা শুনে চাই না। আমার ছেলে বি-এ পাশ করেছে। এখন কি জমি নিয়ে লাভল ধরবো?—চাষার কাজ কব্বো? না, তা হবে না। এখন আর এক হাজার টাকা নগদ দাও, তবে বিবাহ দিব, নতুবা ছেলে নিয়ে উঠলাম।

কন্যাকর্তার পক্ষে অন্য একজন ভদ্রলোক বলিলেন, “মজুমদার মশাই, আপনি একজন সঙ্গতিপন্ন ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক। সামান্য হাজার টাকার জন্ত বিবাহটা পণ্ড করবেন না? আপনি ইচ্ছা করলে হাজারের জায়গার দশ হাজার জোগাড় করতে পারেন। সামান্য তুচ্ছ বিষয়ের জন্য কেন অনর্থক সময় নষ্ট করেন? লগ্নের সময় হলো।”

রাম। দেখুন তো মশাই, আপনি তো সব বুঝতে পারেন, কার দোষ? আমার সঙ্গে যা বন্দোবস্ত হয়েছে, আমি তাই চাইছি। তা ছাড়া আমি কি বেশী চাইছি। এক কাণাকড়ি বেশী চাইব না। আমার যা প্রাপ্য, তাই দিলেই বেকসুর খালাস।

কন্যাপক্ষীয় তৃতীয় ভদ্রলোক বলিলেন, “মশাই! আপনাদের বিবাদ লইয়া খাওয়া দাওয়া পর্যাঙ্ক বৃদ্ধি নষ্ট হয়! পয়সা খরচ করিয়া ও অনেক পরিশ্রম করিয়া লুটি পুরি প্রভৃতি প্রস্তুত হলো—যাতে আপনাদের আনন্দ জন্মে; কিন্তু যে রকম গতিক দেখছি, তাতে একূল ওকূল হুকূল যায়। আমি মশাই, বাড়ীতে রান্না বন্ধ করতে বলে এসেছি। এখন দেখছি, রাজিতে উপোষ পাকতে হবে।”

মশাই! যত্নমদার মশাই! এক কাজ করা যাক, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-
দিগকে আহঁয়ে দেওয়া যাক। তারা কেন আর অনর্থক কষ্ট পান।
ভদ্রলোকেরা নানাগ্রাম থেকে এসেছেন, তাদের কেন আর কষ্ট দেওয়া
যায়।

একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক বলিলেন, “আর মশাই, খাওয়াটা কি আগে?
আপনাদের গোলমালটার মীমাংসা হউক, তার পর না হয় খাওয়া দাওয়া
যাবে। যে স্ত্রে আমাদের আগমন, সেই শুভকার্যের সম্মিলন হ’ক, তার
পর খাওয়া দাওয়া। আমাদের খাওয়া দাওয়া তো পালায়নি, তবে শীঘ্র
শীঘ্র হইত, এখন না হয় কিছু বিলম্বে হইবে। তা বরকর্তার মন কি
ফিরলো?”

রাম। মন ফিরাফিরি কিসের মশাই? আমি কি ভিক্ষা চাইছি,—
না আমার প্রতি অমুগ্রহ কব্তে চাইছি? আমার সঙ্গে যা বন্দোবস্ত আছে,
তা দিলেই আর কোন বক্তব্য থাকে না। আমার চুক্তি মিটিয়ে দিলেই
সব চুকে যায়। মনে করুন, এখন না মিটলে, আর কি কখন মিটবে?

নবাবু। দেখছি ব্যাপার বড় সহজ নয়। যদি বিবাহ হয়, তাহলে মেয়েটা
চিরকাল খোঁটা খাবে।

একজন কন্যাধাত্রী বলিল, “মশাই! আপনারা কোন দোষ দেবেন
না। আমি এইখানে গুটি কতক কথা বলি।—পুঁইপাড়ায় রাধাবিনোদ
দেওয়ানের ছেলের বিবাহ হয়। সে বিয়েতেও এক রগড় হয়। ঠিক এই
রকমের। কন্যাকর্তার সহিত বরকর্তার যে যে সামগ্রী দিবার চুক্তি হয়,
তার মধ্যে একটি সোনার দোয়াত ও একটি সোনার কলম ছিল। দেওয়ান
মশাইয়ের ছেলে তখন এল-এ, পাশ করিয়াছে। এল-এ, পাশ ছেলে আর
যায় কোথা! দেওয়ান মশাই বলিতেন, ‘ছেলেকে যখন দুইটা পাশ
করিয়াছি, তখন কি কিছু লাভ না করিয়া থাকিতে পারা যায়? এত
ক’রে দুধ, কলা, ক্ষীর, ননী থাইয়ে ছেলে মাগুষ করলেম, পরসী খরচ
ক’রে লেখাপড়া শেখালেম, তাকি সব ভস্মে স্নত ঢালা হলো! আমি
তো তা প্রাণ থাক্তে পারবো না। নগদ পরসী খরচ ক’রে ছেলেকে
দু-ছোটো পাশ করিয়াছি, এখন সেই ওজনে টাকা ফেল—মোহর ফেল—
মানিক মুক্ত ছড়াও। কেন? আগুতে বল্লেই পারতে, দেওয়ান মশাই!
আমি গরিব লোক, কেবল কল্যাণী সম্প্রদান ক’রবো; দান দিব, টাকাকড়ি



আলোচনা—৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র।

১৪২৪৪
৪৪ ৪৪

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আলোচনা বিগত বৈশাখ মাস হইতে অষ্টম বর্ষে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আমরা অষ্টম বর্ষের বাবিক মূল্য আদায় জন্য গ্রাহকের নিকট আলোচনা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। গ্রাহকের ভিঃ পিঃ গ্রহণে আপত্তি থাকে, দয়া করিয়া আমাদিগকে জানানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। নতুবা ভিঃ পিঃ প্যাকেট ফেরৎ দিয়া নুণা ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, ইহাই প্রার্থনা। গ্রাহারা ঘড়ি উপহার লইবেন, তাঁহাদের ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং খরচ ইত্যাদি সহ ২৫/০ আনা, আব গ্রাহারা কেবলমাত্র পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদের মাত্র ১৫০ টাকা দিতে হইবে। গ্রাহার যেরূপ ইচ্ছা, তাহা সত্বর জানাইবেন, নতুবা আমরা ঘড়ি উপহার সহ পত্রিকা ভিঃ পিঃ করিব।

দেশীয় ফুলের সেন্ট।—পুরাতন চিনাবাজারের ভারতবিখ্যাত মেসার্স মতিলাল বহু এণ্ড কোং ইহার আবিষ্কর্তা। বেলা, সেফালিকা, চম্পক, মালতি, জুঁই প্রভৃতি নানাপ্রকারের সুগন্ধি দ্রব্য, বিলাতি গন্ধ দ্রব্য অপেক্ষা, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। “বাবহারেণ বিদ্যাতে ফলং।”

কংগ্রেস।—বোম্বাইর অধিবাসীরা কংগ্রেসের জ্ঞাত ইহার মধ্যেই ত্রিশ হাজার টাকা তুলিয়াছেন। কংগ্রেস ও শিল্প-প্রদর্শনীর জ্ঞাত প্রায় ৭৫ হাজার টাকা আবশ্যক। এবার ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে নানা-প্রকার কল আনান হইবে। সার হেনরী কটন সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। তিনি আরেবিয়া ষ্টীমারে ২৪শে ডিসেম্বর বোম্বাই পহুঁছিবেন। বোম্বাইর গভর্ণর প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিবেন।

বৃত্তিদান।—বঙ্গের সমস্ত জেলায় ৩২৬টা মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি, সমস্ত মহকুমায় ৩১৫টা উচ্চ প্রাইমারি বৃত্তি ও সমস্ত থানায় ১২৪৬টা নিম্ন প্রাইমারি বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

শির্ষাজী উৎসব।—৩১শে ভাদ্র অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময় টাউন হলে মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সভাস্থলে প্রায় ৪০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন বঙ্গের শ্রীশিক্ষা।

এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—এই সংস্কার ও পরিবর্তনের দিনে, প্রাচীন বঙ্গের কোন কথা সভ্য পাঠকবর্গের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়া নীরবে অবস্থান করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। এইজন্য আমরা প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গের শ্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটি কথার অবতারণা করিতেছি।

আজকাল আমাদের দেশে শ্রীশিক্ষার বড়ই আদর, সাধারণে শ্রীশিক্ষার বড়ই পক্ষপাতী। মহিলাগণকে সংশিক্ষা দেওয়া অতীব কর্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এখন অনেকেই বলিয়া থাকেন, প্রাচীন বঙ্গ শ্রীশিক্ষার আদৌ প্রচলন ছিল না, একথা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, তাহা প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে পারিবেন। এখনকার অপেক্ষা পূর্বকালে আমাদের দেশে শ্রীশিক্ষার জন্য অতি পবিত্র নিয়ম-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তখনকার নারীগণ শৈশব হইতেই শিক্ষিতা হইতেন, সে শিক্ষা অবশ্য আধুনিক প্রথাভূসারে মিশনারী বিদ্যালয়ে বা শিক্ষকের নিকট হইত না,—পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধা নারীগণই বালক বালিকার শিক্ষা বিধান করিতেন। বালিকাগণ শৈশবে মাতামহীর স্নেহময় কোড়ে শয়ন করিয়া, নানাবিধ নীতিমূলক রূপ কথা শ্রবণ করিতেন, নানাবিধ বারম্বার তাঁহাদের কমনীয় চিত্ত-ফলকে পবিত্রতার ছায়া পতিত হইত, মাতামহের ও অত্যাশী গুরুজনের নিকট রামায়ণ মহাভারতাদির গল্প শ্রবণে বালিকাদের স্নকুমার কোমল হৃদয়ে সীতা, লাবিণী, দময়ন্তী, শৈব্যা প্রভৃতি সত্যীকুল সিমন্তিনীগণের আদর্শ চরিত্র একবারে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যাইত,—সে অঙ্কন চিরকাল সমভাবেই থাকিত, জীবনে কখন ঝলিত হইত না। তাহার পর প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা রমণীগণের নিকট নানাবিধ সম্ভ্রান্ত লোকের সাংসারিক ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া, অল্পবয়সে তাঁহারা সাংসারিক বিষয়ে যেরূপ অভিজ্ঞতালাভ করিতেন,—এখনকার নভেল-নাটক-পাঠিকা, চতুর্দশবর্ষীয়া, বিলাতি আদর্শ গতিভা যুবতীগণের সে জ্ঞান হয় না। ইহারা কেবল বিলাসিতা লইয়াই সাবান্নি ব্যস্ত থাকেন। তখন তরলমতি নবমবর্ষীয়া বালিকার যে জ্ঞান ছিল, এখন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সে জ্ঞান আদৌ নাই। তখনকার নারীগণ

শিক্ষিতা হইলেও এখনকার নারীগণের মত বটতলার “প্রেমপত্র” হইতে উদ্ধৃত করিয়া স্বামীকে পত্র লিখিবার নিয়ম প্রণালী অবগত ছিলেন না। এখনকার শিক্ষিতা মহিলাগণের ন্যায় তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবির ভাব ভাষা অপরূপ পূরণ “সে কেন এলো না?” “কে যেন ভাল-বাসে?” ইত্যাদি হা-ছতাসময় কবিতা লিখিতেন না! এখনকার শিক্ষিতা রমণীগণের ন্যায় তাঁহারা লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া, আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে পতির সহিত প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন না। তাই বলিয়া কি সভ্যতাব্যবস্থার রক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইত না, না—তাঁহারা পতিকে আদর কবিতো জানিতেন না। তাঁহারা বেকপভাবে পতিকে মান্য করিতেন, দেবতা নিক্রিংশেবে পূজা করিতেন, এখনকার কল্পজন শিক্ষিতা রমণী তাহা করিয়া থাকেন, বা করিতে জানেন?

বাঙ্গালীর মেয়ের শিক্ষা যে বিলাতী আদর্শে হওয়া উচিত নহে, হইলে যে বিষময় ফল হইবে, তাহা কি কোনও সংস্কারক স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বঙ্গকুল ললনাগণ লজ্জার জন্ত—তাঁহাদের অমূল্য সতীত্ব রত্নের জন্ত ভূবনবিখ্যাত, কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য জ্ঞানশিক্ষারূপ করাল কীট, সেই মধুর সৌরভাখিত কুণ্ডলে কেমন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অসার অপদার্থ করিয়া ফেলিতেছে; তাহা কি স্বর্ণ চন্দ্রাধারা, বক্তৃতাবাগীশ সমাজ-সংস্কারকগণ দেখিয়াও নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন। প্রতিদিনের চক্ষের সম্মুখে কত বীভৎশ ঘটনা সজ্জ্বলিত হইতেছে, তাহা কাহারও অবদিত নাই। নারীজাতির পতিই সর্বসর্গ—প্রত্যক্ষ দেবতা। এমনূয় শিক্ষা কি আর কোন দেশের, কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে? এখন জী-স্বাধীনতাই শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য। হায়! যে বঙ্গগৃহে এককালে শতস্বর্গ্য দীপ্তিময়ী মণিময় মরকতরাজী বিরাজমান ছিল, এখন তাহারাই আবার দীনহীন দরিদ্রের নিকট রত্ন লাভাশায় অগ্রসর হইয়াছে, উজ্জ্বলাভূর্ণ কাচখণ্ডকে হীরক ভ্রমে নিজেদের সজ্জিত মহামূল্য মরকতমণি পদভাঙনার দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। ইহাতে আমাদের তিলমাত্র লজ্জার উদ্রেক না হইয়া বরং আমরা সেই শিক্ষাকেই প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী ভাবিয়া প্রশ্রয় প্রদান করিতেছি।

তখনকার রমণীগণ পতিকে ইহ ও পরকালের দেবতা বলিয়া ভক্তি করিতেন, আর এখনকার পাশ্চাত্যশিক্ষার শিক্ষিতা বিলাসিনীগণ পতির

প্রতি নিত্যন্ত অহুগত ভূতাব স্থায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা নিজেদের দোষে এই যন্ত্রণাভোগ করিতেছি। দোষ আর কাহারও নয়, তাই কবি বলিয়াছেন,—“দোষ কার নয় গো শ্রামা, আমি সখাদ সলিলে ডুবে মরি।” জ্ঞানীশিক্ষা ব্যতিক্রম ঘটাই যে আমাদের এত দুর্গতি হইতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? ভুক্তভোগীমাত্রেই বলিবেন, আমরা নিজেই নিজের পদে কুঠারঘাত করিতেছি, অপরকে দোষ দিলে কি হইবে? কেন, পূর্বে আমাদের দেশে যে সকল শিক্ষিতা রমণী সমাজ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, পাঠক! তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র “লীলাবতীর” কথা স্মরণ করুন; যাঁহার সামান্যমাত্র গণিত প্রশ্ন সমাধান করিতে আজকাল অনেক অশিক্ষিত অধ্যাপকের মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। পূর্বে আরও কত শত শিক্ষিতা রমণী ছিলেন ও তাঁহাদের ধর্মসম্বন্ধীয় অনেক রচনাদিও ছিল, তবে তখন মুদ্রায়ন্ত্রের অভাব ছিল বলিয়া, সেই সমস্ত রচনাবলী প্রকাশ হইতে পার্য নাই।

আজকাল যেভাবে জ্ঞানী জাতিকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে নারীজাতি কোন ক্রমেই স্বার্থ শূণ্যবতী ও জ্ঞানবতী হইতে পারেন না। তাহাতে বুদ্ধি মার্জিত হইয়া ধর্মজ্ঞানের উদয় না হয়, তাহাকে আমরা আদৌ শিক্ষা বলিয়া বিবেচনা করি না। বন্ধিমবাবুর কৃষ্ণকান্ত উইলের “ভ্রমর” চরিত্র পাঠ করিয়া আজকালকার রমণীগণ কি শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন? শিক্ষার বিষয় তাহাতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু কয়জন সে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন? কেবল গল্পের মনোহারিত্বে পুস্তক পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। প্রাচীনকালে বঙ্গ-ললনাগণ মহাভারতের দময়ন্তী শৈব্যাদির কথা শুনিয়া ইহা অপেক্ষা অনেক শিক্ষালাভ করিতেন। আজকাল বিজ্ঞানগণ কেবল যীশুর ছড়া ও তাহার পর নাটক, নভেল উদয় করিয়া চঞ্চলস্বভাবা বালিকাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া নিজের চিত্তই সংযত রাখিতে পারে না, তা শিক্ষা তা পরের কথা।—অধুনা ইহার প্রচার দেখিয়া আমাদের বঙ্গসমাজ সংস্কারকগণও অউচ্চ কণ্ঠে অত্রভেদী-ভুহিন-কণামণ্ডিত, শীতল নির্ঝর-শীকর পরিশেবিত হিমালয় হইতে নীলোশ্মি-বেষ্টিত, ফেনিল তরঙ্গাভিত ও কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া বলিতেছেন,—“জ্ঞানী শিক্ষা দাও, আরও দাও।”

বাঙ্গালী মেয়ের মন, প্রাণ, হৃদয়, দেহ সবই বাঙ্গালার উপাদানে

গঠিত; তাহাদের বলপূর্ব্বক পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত করিতে গেলেই ত বিভ্রাট হইবে; তাই আজ ভারত বিভ্রাটময়। হিন্দুর সংসারে জী-জাতিই সারস্বত, তাঁহারা যদি আধুনিক শিক্ষার দোষে ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতে লাগিল; তাঁহারা যদি ধর্ম্ম বিচ্যুত হইতে লাগিল, তাহা হইলে আর আমাদের শ্রেয়ঃ কোথায়? অতএব প্রাচীন বঙ্গে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে সেই শিক্ষাই আমাদের জীগৎকে পুনরায় দেওয়া উচিত, নতবা অধঃপতন অনিবার্য্য।

পরিশেষে আমাদের বরুণ্য এই যে, জগৎপাতা জগদীশ্বর যখন তাঁহার অপার করুণাশি প্রকাশ পূরক আমাদেরকে সর্বস্ব ও সর্ব বিষয়েই উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রদান করিয়াছেন ; তখন কালের গড্ডালিকা প্রবাহে গাত্রাবগাহন পূরক ভাসমান হইয়া সে সকল বিন্দুত হওয়া অপেক্ষা সেই সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শে যদি আমরা আমাদেরকে পুনরায় গঠিত করিতে পারি, তাহা হইলে আর আমাদেরকে ভিক্ষকের ভ্রাতৃ বিজাতীয় হীন আদর্শের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে না ; পরন্তু আমরা আন্যাসে পূর্ব শিক্ষাভ্রাসারে আমাদের রমণীবর্গকে ধর্মশিক্ষা প্রদান করিয়া সুখে কালান্তিপাত করিতে পারিব, সন্দেহ মাত্র নাই ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

যমুনা জলে ।

যমুনার কাল জলে, তেমনি প্রবাহ চলে,

আজিও বুকেতে ভাসে লহরী মন্থর ।

অতীতের সাধা করে, আজিও ভেমন করে,

সমীরে ডাসিছে গান, যুহু তর তর।

কিন্তু হায় ! আর যেন, লাগল করে না হেন,

ବାଞ୍ଛେ ନା ବାଞ୍ଛନ୍ତୀ ଆର ପରାଂ ବ୍ୟାକୁଳ ।

যমুনার কাণ জলে, শুধু যেন কেঁদে বলে,

হারায়েছি শ্রামটাদে, বেহুষ বেভুল ।

শ্রীদেবেশ্বরনাথ মাহাত্ম্য ।

পাপীর পরিতাপ ।

আগে কি জানিরে হয় এমন বিষম,
 পাপের সে অমৃতাপ বৃষ্টিক দংশন !
 তাহলে কি অকাতরে, ছিন্ন করি মায়াডোরে,
 খেদাই গহন বনে পিতা পূজাতম,
 ভাষায়ে নয়ননীরে জননী রতন ॥
 ওই শিশু সুকুমার, শোণিতাক্ত কলেবর,
 শীর্ণদেহ দেখ দেখ বিদরে হৃদয় ।
 লইয়ে লোহার শলা, ভীমানলে সমুজ্জলা,
 ছুটিয়া আসিছে ওই বিধিতে আমায় ।
 কে আছে—কোথায় আছে যায় প্রাণ যায় !
 হৃদয়েতে নিরবধি. এ ভাব জানিত যদি,
 তুচ্ছ অলঙ্কার লোভে বধি কিরে তায় ?
 বিদারিতে অংপিও নথর প্রহারে—
 উপাড়িতে আঁখিদ্বয়, ওইরে বিধবা ধায়,
 হায়রে হরেছি ওর নয়নের মণিরে ॥
 কোথা প্রভু দয়াময়, নিবার এ যাতনায়,
 অলিছে অলিছে প্রাণ অলিছে বিষম ।
 অথবা হে জগপতি, অধম পাপীর পতি,
 না ফিরাতে পার যদি সদয় লোচন—
 ভীম অশনি হকারে, ভস্মীভূত কর মোরে,
 নিবাও বিষম জালা ঘৃচাও বেদন ॥
শ্রীউপেক্ষমোহন গুপ্ত ।

আওল সজনি ।

সজনি সজনি আওল চের লো

যমুনা উছলি ধায় ;

মধুর অধরে মঞ্জুল ধনিয়া

যমুনা ধাবয়ে যায় ।

ফুল চাঁদনী হিলোলে লহ

নাচত হিলোলি সাথ ;

ভাব-ভরলে চাইছে কুয়ল

তরুণ তমাল মাথ ।

বরখে কবই হরখে ছোছনা

তরণী যমুনা-লোরে ;

সাতালি পবন রভস হিয়ে

তরণী সঙে থোরে ।

গগন সোসরি যমুনাক বারি

সুনীল উষ্ম-পুঞ্জে ;

শ্রাম রাধিকা তরণী উপরি

সুখদ রাইতি ভুঞ্জে ।

গোপিকা করেতে দোহুল দোলায়ে

ফুল-কুসুম মালা ;

বাঁশক বাঁশরি হেলরি সোহালে

বাইয়ি নান্দ লালা ।

নাচ নাচ তরি নাচত যমুনা

কিলি কিলি ভায়ে ;

মরল মরমে বতেক গোপিকা

সুন্দর বজ হাসে ।

শ্রীব্রজসুন্দর সায়াগল ।

আমার কি দোষ ?

ও কথা কখন, মুখে আনব না আর।
 বললে তোমরা হুধু, মুখ কর তার।
 সপ্তদশ বর্ষ আমি, দেখিলাম যা'রে,
 বল না কেমনে আজ, ভুলে যাব তা'রে।
 নীহারে মগন ধরা, প্রভাত সময় :—
 যে মুখ অতীত গর্ভে হ'য়ে গেল লয়।
 ল'য়ে গেল হুধু শাস্তি, জনমের তরে,
 রাখিয়ে গভীর চিহ্ন প্রাণের ভিতরে।
 রাবণের চিতা সম, জলে অনিবার,
 এই অগ্নি নিভিবে না, নিভিবে না আর !
 এইত হু-দিন আগে, হুইজনে মিলি,
 জীবন উজ্জানে কত, করিয়াছি কেলি।
 এখনো পড়িলে মনে, মুখখানি তার,
 হৃদয় পুড়িয়ে যেন, হয় গো অঙ্গার।
 আমি চাই ভুলিবারে, ভুলে না যে মন,
 পারি না সহিতে হায় ! স্মৃতির দংশন।
 তোমরা সকলে, বৃথা কেন কর রোষ,
 পারি না যে ভুলে যেতে, আমার কি দোষ ?

শ্রীরাঙ্গেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিতে পারবো না । তখন দেখা যেতো, আমি যা হয় একটা ক'রে ফেলতাম । আমার ছেলের বিয়ে আর এক জায়গায় জোগাড় কর্তেম । ছেলের বিয়ের আবার ভাবনা !!! এখনকার এক গোঁ উঠেছে, মেয়ে দিতে হলে টাকা বাব করতে চায় না । সে কি কথা ? পাশকরা ছেলে নেবে, আর টাকা দেবে না ; এ কি সম্ভব ! এমন কি হতে পারে ? তখন বুঝতে হয় । পরিণাম না ভেবে কাজ ক'তে নাই । পরিণাম ভেবে কাজ করলে আর ঠকতে হয় না । বিচার !!! কিসের বিচার ? আমি যখন ছেলেকে পরীক্ষা দিবার সময় ফি দিয়াছিলাম, তখন কি ইউনিভারসিটি বিচার কবেছিল ? তাতো দেখতে পাই না । সে তো ছ-হুবার ! হুবারই টাকা নিয়ে তবে ছেলেকে পরীক্ষা দিতে দেয় । একবার দশ টাকা—আর এক-বার কুড়ি—পাঁচগুণ টাকা ! কই ? তখন তো বিচার কেউ করলে না ? যদি বলতাম, মহামাঈ শ্রীল শ্রীবুদ্ধ ইউনিভারসিটি ! আমার হাতে টাকা নাই, অতএব অচুগ্রহ করিয়া আমার ছেলেকে পরীক্ষা দিতে দাও, বলুন দেখি মশাই ! আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক—আমার ছেলে কি পরীক্ষা দিতে পেতো, না পরীক্ষায় পাশ হতো ? এমন কথা কখন শুনিনি—পরীক্ষার ফি না দিয়া মহামাঈ শ্রীল শ্রীবুদ্ধ ইউনিভারসিটি কাউকে পাশ দিতে দিয়েছে । আমি কি মশাই এত বোকা ? যে যাব আপনার গুণ বুঝে নিলে, আর আমি হাবাগোবার মত ছেলের বিয়ে দিব, দস্তুর মত চার্জ করবো না ? যেমন জিনিষ তেমন মূল্য দাও, বস ; আমার কথা চুকে যায় । আমিও যেমন নগদ নগদ মূল্য দিয়ে জিনিষটাব দর বৃদ্ধি করে আসছি, তেমন আপনি নগদ মু—মু—মু—মু—উ—উ—” আর কথা বাহির হইল না ।

সকলেই দেখিতে পাইল, সাতজন পাহারওয়ালা, চোদ্দজন চৌকিদার, দুজন দারোগা ও একজন পুলিশ ইন্স্পেক্টার সেই দিকে আসিতেছে । ব্যাপার কি ? সকলে একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে । লাল পাগড়ি, বড় সহজ নয় ;—কোন গুরুতর বিষয় না হলে লালপাগড়ি আসে না ? এ যে দেখছি, এক নূতন বিপদ ! একে কামিনীর বিবাহ হইতেছে না, তাহাতে আবার কি এক নূতন বিপদ উপস্থিত ? নানা জনের মনে নানা বিষয় উদয় হলো ; কতকগুলি লোক বিবাহ সভার এক কোণে দাঁড়াইয়া বলাবলি করিতেছে,—

১ম ব্যক্তি । আর কামিনীর বিবাহভোকে খেতে হবে না, এখন সব পড়া যাক, শেষে কি তাতে দড়ি পড়বে ?

২য় ব্যক্তি । তাইত দেখছি, বিয়েতে পূর্ব ভোজ খেতে এসেছিলাম, এখন পিঠে না খেলে বাচি ।

৩য় ব্যক্তি । আচ্ছা, এত লাল পাগড়ি কেন ? রত্নপুরে লাল পাগড়ির ঘটা তো কখন দেখিনি !

১ম ব্যক্তি । লালপাগড়ির ঘটা দেখিস্নি, এইবার দেখ । আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক, ভাল করে দেখবি ।

২য় ব্যক্তি । ভয় কিসের ? আমবা চুরি করতেও আসিনি, ডাকাতি করতেও আসিনি ; আমবা বিয়েতে ভোজ খেতে এসেছি ! ভোজ দেবার না ইচ্ছে হয়—বঃ, চলে যাচ্ছি ।

৪র্থ ব্যক্তি । আচ্ছা, লাল পাগড়ির হঠাৎ আবির্ভাব কেন ? নিশ্চয় একটা কাণ্ড হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নাই ।

১ম ব্যক্তি । বিয়ে বাড়ীতে বর এসেছে বিয়ে করতে, বিয়ে হবে, ভোজ গাব ; এই জানি, লালপাগড়ি আনাগোনা কেনন করে জানবো ।

২য় ব্যক্তি । আচ্ছা, যে রকম গতক দেখছি, তাতে এখানে থাকা ভাল, না এখান থেকে সব পড়াই ভাল । আমার বিবেচনায় সরে পড়াই ভাল ।

৩য় ব্যক্তি । তুমি যা বলচো, সেটা ঠিক । শেষে যদি কোন ক্যাসাদে গড়তে হয় ।

৪র্থ ব্যক্তি । সরে পড়বার দরকার কিছু দেখছি না, তবে ওদের কথাবার্তা শুনলে মন্দ হয় না ।

২য় ব্যক্তি । পাহা ! গরম গরম লুচিগুলি ফেলে যেতে মন্টা কেনন করছে ।

১ম ব্যক্তি । তা যখন বিপদ দেখছি, তখন লুচিতে কাজ নাই ।

৪র্থ ব্যক্তি । ওহে, তোমরা একটু থাম, আমি ব্যাপারটা কি জানছি ।

২য় ব্যক্তি । আর জানাজানির দরকার নাই, চল ঘরে যাই । কি জানি, মাকী ক'রে ফেললে, তখন কাছারি আর ঘর করতে হবে ।

শেষে তাহারা সরে পড়াই ঠিক করিল । এদিকে যেমন লালপাগড়ি বিবাহ সভায় আসিয়া উপস্থিত, ওদিকে অমনি তাহারা অন্ধকার রাत्रে কোথাও মিশাইয়া গেল ।

লালপাগড়ি পৌছিবাব পূর্বে অন্য কোণে আর একদল বণাবলি করিতেছে ;—

১ম ব্যক্তি। মজুমদার বড় সাধারণ লোক মনে করো না যে, অমনি ছাড়বে ? বোধ হয় তলে তলে পুলিশকে খপর দিয়েছে ।

২য় ব্যক্তি। তাই ঠিক ! লোক ঠিক কর্তে মজুমদারের মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। আমি ভাবছিলাম, যে রকম ব্যাপার হয়ে উঠছে, তাতে একটা কিছু হবেই হবে।

৩য় ব্যক্তি। মজুমদার ডাকসাইটে মজুমদার, ওকে চেনে না কে ? ইস্তক জজ ম্যাজিষ্টার থেকে, মুটে মজুর পর্যন্ত তাঁকে সকলেই চেনে। আমি যখন কাছারি গিয়েছিলাম, তখন মজুমদারের নাম সকলের মুখে শুনেছিলাম।

১ম ব্যক্তি। আচ্ছা মশাই, মজুমদার কি সত্য সত্যি খানায় খপর দিয়াছিল ? খানাও তো বড় কম দূর নয়। ছ-ছকোশ রাস্তা।

২য় ব্যক্তি। মজুমদার যদি তাই না করবে, তবে খানার দারোগা এখানে আসবে কেন ?

৪র্থ ব্যক্তি। এরা কেন এসেছে, তাতো এখন বলা যায় না। তবে এদের কাজকর্ম দেখলে কতকটা জানতে পারা যাবে।

২য় ব্যক্তি। খানার দারোগা প্রভৃতি এখানে কি লালপাগড়ি মাথায় দিয়ে নিমন্ত্রণ পেতে আসছে ? আপনার কথা ত বড় মন্দ নয় ?

৪র্থ ব্যক্তি। আমি কি তাই বলছি। আমি বলছি, এরা এসে কি করে, দেখা যাক, তবে তো এদের ভিতরের মতলব জানতে পারবো ?

৩য় ব্যক্তি। না মশাই, আপনারা ভুল বুঝেছেন, কৃষ্ণ মজুমদারের মেয়ের বিয়ে, এ কথা সকলেই জানতে পেরেছে, সেই জন্য পুলিশের ইন্স্পেক্টর মজুমদারের সম্মান রক্ষা করতে আসছে !

১ম ব্যক্তি। তাই হবে।

৪র্থ ব্যক্তি। আপনাদের কথাই ঠিক মান্লেম। কিন্তু কৈ, পুলিশের লোক বিয়েতে আসবে, এ কথা তো একবারও শুনিনি। সত্য হলে কথা গোপন থাকতো না।

৩য় ব্যক্তি। হাঁ তাতো বটেই ! তা হলে পুলিশের লোকের থাকবার ও বসবার জায়গা আশু থাকতে জোগাড় হতো।

৪র্থ ব্যক্তি। আর ছ-চারিটা চৌকিদারও মতামতের থাকতো। ইন্সপেক্টর এখানে আসবেন এ কথা পূর্বেই জানাজানি হয়ে যোতো; কিছুই ছাপা থাকতো না।

অতদিকে আর একদল বলাবলি করিতেছিল। এরা বরণক্ষীয়।

১ম ব্যক্তি। এইবার ঠিক, ঘোষাল ভারী মৎলবে নাগ্রহ।

২য় ব্যক্তি। তা না হলে অত জোর করবে কেন; “টাকা দাঁও, টাকা দাঁও” বলে অত লাফালাফি?

১ম ব্যক্তি। কোমরে জোর আছে বৈ কি! ভিন্ গায়ে এসে প্রাণের ভয় নাই? যে রকম গতক হয়ে দাঁড়া’ল, আমার তো মনে বড় ভয় হয়েছিল, বুঝি একটা কাণ্ড বাধে।

৩য় ব্যক্তি। দাঁও মেরেছে, সে দাঁও কি ছাড়তে পারে?

১ম ব্যক্তি। পুলিশের সঙ্গে বড়বয়স ক’রে তবে ঘোষলে গ্যাট হয়ে বসে আছে। তাই অত জোর।

২য় ব্যক্তি। তাতো ঠিক! রত্নপুরে এক একটা রত্ন আছে, তা কি কেউ জানে না?

৪র্থ ব্যক্তি। যখন ঘোষাল বাড়ী থেকে বার বয়, সেই সময়ে বলেছিল, যদি টাকা চুকিয়ে না দেয়, আমি একটা কাণ্ড করবো। এখন দেখছি, যেমন কথা তেমনি কাজ।

২য় ব্যক্তি। যেমন গাঁ, তেমনি কাজ না করলে চলবে কেন? মজুমদারকে যেমন মনে ভাব্তেম, এখন দেখছি তেমনটী নয়। ভিতরে ভিতরে ঢালাকি খেলেছে।

১ম ব্যক্তি। যে যেমন, তার সঙ্গে তেমনি ব্যভার করা ত চাই?

৩য় ব্যক্তি। হাঁ—হাঁ, মনে করেছিল, অবশিষ্ট টাকা কাঁকি দিব, তা, ঘোষাল তেমন নয়!

১ম ব্যক্তি। ঘোষালকে আমি বেশ চিনি। সেবারে গিরীশ তরফদারকে কম নাকালটা করলে। সাড়ে সাতশ’ টাকা আদায় ক’রে তবে ছাড়লে।

৩য় ব্যক্তি। পঞ্চাশ টাকা ধার দিয়ে সাড়ে সাতশ’ টাকা আদায় করলে সাত বৎসরে। ও সেই ঘোষাল তো! টাকার যৌক। টাকা পাবার আশা থাৎলে আর নিস্তার নাই।

২য় ব্যক্তি। আদালতে যুদ্ধে বাবু ও উকীল বাবু দুজনে কত অল্প-
রোধ করলে তরফদারের প্রতি দয়া করতে, কিন্তু দয়া করা দূরে থাক,
ঘোষাল বললে, “আমায় কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক’রে দিক্, আমি ওসব
শুনতে চাই না। আমি গরিব মানুষ, টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি কিছুই
নাই। আপনারা আমার প্রতি দয়া করুন।” কাজেই তখন তরফদারকে
সাড়ে সাতশ’ টাকা গুণে দিতে হলো।

১ম ব্যক্তি। এমন লোকের কাছেও টাকা দার নেয়, না খেয়ে শুকিয়ে
থাকা ভাল—বিষয় উচ্চর যায় সেও ভাল, তবু এমন লোকের কাছে
দার নিতে নাই।

৪র্থ ব্যক্তি। দেখবেন, ঘোষাল কড়ায় গণ্ডায় টাকা গুণে নিয়ে তবে
ছেলের বিয়ে দিবে। যদি টাকা না দেয়, তবে ছেলের বিয়ে কখনই দিবে
না। ও তেমন ছেলে নয়!

২য় ব্যক্তি। হাকিমের কথা ঠেলে ফেললে, তা কোথাকার মজুমদার!
ছেলের বিয়ে হক্ আর নাই হক্, ওব কিছুতেই আসে যায় না। ওর
টাকা হলেই হলো।

ওদিকে রত্নপুরের কয়েকটি রত্ন ছিল, তাহারা পরামর্শ করিতে লাগিল।

শিরীষ নাগিত। এখন কি করা যায়? মজুমদারকে তো বড় বিপদে
ফেললে দেখতে পাই।

কর্মকার। নবাবু, আমাদের একবার হুকুম দিন না, ঘোষালের মাথাটা
নিশে আসি।

নবাবু। না হে না, এখন বুজির কাজ করতে হবে, ওসব করলে
চলবে না। কেমন ক’রে ভদ্রলোকের মানসন্ত্রম বাঁচে, তারই চেষ্টা কর।
মারামারি ক’রে কোন ফল নাই।

কলুবুড়। তা—তা—তা—হ—হ—হ। ড—ড—ড—অ—দ—র কি—
কি—কি ও—ও—ও জা—জা—জা—নে—নে—। লা—লা—লা—ঠী—ঠী
ক—ক—ক—ক—ই?

নবাবু। না না, লাঠী রাখ, আমার কথা শুন। বিয়েতে রাগায়াগি
ভাল নয়। আমি ঘোষালকে বিশেষ ক’রে নেড়ে চেড়ে দেখেছি। ও
সে পাজ নয়। ক্রমশঃই গরম।

শিরীষ নাগিত। এমন জায়গার ঘরের বিয়ে দিবার জন্ত লাকাচ্ছিল?

নবাবু। ওহে, তোমরা বুঝ না, সাথে কি গাফিলি। ছেলেটা বি-এ পাশ করেছে; এমন ছেলে যে পাওয়া যায় না। কাজেই এত অপমান সহ করতে হয়।

কর্মকার। আমরা মুখা স্থখা লোক, লেখাপড়ার ধার ধারি না। যেমন কুকুর, তেমনই মুণ্ডর দরকার। আমাদের গাঁয়ে এসে এত ফুটানি। আমি তা সহ করতে পারবো না। রত্নপুর গ্রামে কখন কেউ টু-শক করতে পারেনি। আর কোথাকার এক ঘোষাল এসে গাঁয়ের মাঝখানে বসে যা খুসি তাই করবে, আর আমরা “হাড্‌গোড় ভান্সা দ” হয়ে চুপ্‌ট ক’রে থাকবো, নড়তে চড়তে পাবো না! নবাবু, একবার আমায় হুকুম দিন, আমি একবার দেখে নি। দেখি ও কেমন ঘোষাল।

নবাবু। (হাসিতে হাসিতে) আরে চুপ চুপ, ওসব কথা নিয়ে এত চেষ্টামেচি করতে নাই। সব কাজ বুঝে করতে হয়। তুই যেমন ষণ্ডা, তেমনি গুণ্ডার কাজ ভালবাসিস, এমন করতে নাই।

শিরীষ নাপিত। নবাবু যা বলছেন তা ঠিক, উতলা হলে কাজ হবে না, ফিকিরে কাজ সারতে হবে।

কর্মকার। তুমি তো নাপিত ভায়া—“নরাণাং নাপিতঃ ধূর্তঃ”, এখন কি করলে কাজ সিদ্ধ হয়, তাই ফিকির কর। আমার মতে শুভকার্য সম্পাদন করতে হলে জোর যার মূলুক তার। “প্রহারেণ ধনঞ্জয়।” আমার মোটা বুদ্ধিতে যা আসে, তাই বল্‌লাম, তোমরা যা ভাল হয় তাই কর। আর যদি আমার সাহায্যের দরকার হয়, তাতেও আমি গর-রাজি নই।

শিরীষ নাপিত। আচ্ছা, শুন দেখি, আমার মনে এক ফিকির আসছে, তবে কাজে কতদূর দাঁড়াবে, তা বলতে পারি না।

নবাবু। আচ্ছা বল, শোনা যাক, যদি লেগে যায় তো লেগে যাবে।

শিরীষ নাপিত। দেখুন! একটা কাজ করলে হয় না? বরকে ধরে একবার চেষ্টা করলে হয় না? বর আর কোচি থোকা নয়, লেখাপড়া শিখেছে, বিশ্বে বুদ্ধি আছে, তাকে একবার বুঝিয়ে স্নিগ্ধিয়ে বললে হয় না—যে একজন ভদ্রলোকের মানসম্মত যায়। তুমি যদি ভদ্রলোকটিকে রক্ষা কর।

কর্মকার। বাপের কথা কি ঠেলতে পারবে, এমন তো বোধ হয় না। কেমন কেমন বোধ হচ্ছে।

নবাবু। না, শিরীষ কথাটা মন্দ বলেনি। ছেলের পেটে তো বিড়ে আছে, বয়স একুশ বাইশের কম নয়, হয় ত মনে লাগতেও পারে।

কলুবুড়। বা—বা—বা—বা! যু—যু—যু—তি! ভা—ভা—ভা—ভা—ল
এ—এ—এ হ—হ—হ—হ—বে—।

নবাবু। আচ্ছা শিবীষ, তুমি বখন এ যুক্তি বের করেছ, তখন তোমার এ কাজে হাত দেওয়া উচিত।

শিবীষ। আচ্ছা দেখা যাক।

কলুবুড়। উ—উ—উ—উ, কি—কি—কি, এ—এ—এ।

কর্ণকার। লালপাগড়ি যে দেখছি—! ও বাবা! এ যে অনেক!

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

এদিকে ইন্স্পেক্টর, দাবোগা, পাহাবওয়াল, চৌকিদার দ্ব হইতে উজ্জল আলো দেখিতে পাইল; ইন্স্পেক্টর বিপিনবাবু দাবোগাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ওহে অমৃত! এখানে কি কোন বিবাহ আছে? ভারি ধুম যে দেখছি! তবে হয় ত দাগি ব্যাটা এখানে থাকতে পারে?”

দাবোগা। আঞ্জে, আমার বোধ হয় এখানে বিয়ে। (চৌকিদারের প্রতি) হাঁবে হিরে, তোদের গাঁয়ে আজ কি বিয়ে ছিল?

হিরে চৌকিদার। আঞ্জে, মজুমদারের মেয়ের বিয়ে।

ইন্স। শালা, তুই আগে বলিস্নি, শালাকে ছই গুতা লাগাও!

হিরে। হজুব গরিবের মা-বাপ, আমি ভুলে গিয়েছিলেম।

রামদিন্ পাহারাওয়াল। আরে হিরে, তোম্ বড়া বদ্‌ম্যয়েস্ আছে। লুচিপুри হিঁয়া হোতা, তোম্ কুছ নেই বোলা! বড্ডী য়ুত হায়।

ইন্স। রামদিন্, তোম্ জন্দি হুঁয়া যাও, আউর হাম্‌লোক ইধার আয়া, খপর দেও।

“যো হুকুম” বলিয়া এবং এক লম্বা ছেলাম হুকিয়া রামদিন বিবাহ-সভার উপস্থিত। রামদিন অনেক লোকের সমাগম দেখিল, তত্রাচ নিজের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য বলিল, “হিঁরা কোন্‌ হায়?”

কন্ঠাকর্তা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “কেল, কি চাই?”

রামদিন। আরে, হাম্ চিল্লাতা, আউর আদমি লোক নেহি জন্তা।
আপ্ কিস্তেরে আদমি হ্যায়? হাম্ কোন্ হ্যায় চিন্তা নেই?

কন্ঠাকর্তা। হাঁ, তোমায় খুব চিনি, এখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে হবে না, কি দরকার, বল?

রামদিন। হিঁয়া কিয়া হোতা! সাধি—বাহা! বাহা! বাবু কাঁহা—
কিস্কা সাধি—বাবুকা লেড়্কা বা লেড়্কা?

রামদিন যোগে যোগে নিজের পেটের ধান্দায় আছে। যোগাড় যোগাড় করে পুরি আদায়ের দিক্‌ব করিতেছে।

কন্ঠাকর্তা। হাঁ, আমাব মেয়েব সাধি। কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করে দিব?

রামদিন। (হাসিতে হাসিতে) বলি, ইন্স্পেক্টার সাহেব, আউর জমাদার সাহেব, আউর দাবোগা সাহেব, আউব গিবিদারী, আউব তুলসি সিং, আউর ছোপদার হালদার, আউর হামি। এ সব আছে। সাহেব আতা হ্যায়, হাম্ আগাড়ি আয়া।”

তখন তাড়াতাড়ি মজুমদার ইন্সপেক্টরের নিকটে গিয়া সেলাম করতঃ বলিলেন,—“যখন গরিবের বাড়ী পায়ের ধূলা প’ড়েছে, তখন যৎসামান্য কিছু জলযোগ কোরে যান।”

দারোগা। অচ্ছ।

মজুমদার অগ্র স্থানে তাঁহাদের খাইবার আয়োজন করিয়া দিলেন। তাঁহাদের যে উদ্দেশ্যে আসা, তাহাব কিছুই অনুসন্ধান হইল না, তবে পেটের পূজা সমাপ্তান্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ গাঁয়ে সন্ধ্যার পরে তাঁহাদের আসিবার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। রত্নপুরের লাগাও সুন্দরপুরে এক দাগি বদমাস থাকিত। তাহাব নাম কেলে চামার। সে ছয়বার জেল খাটিয়াছে। গাঁয়ে আবার চুরি, তাকে গাঁয়ে না দেখন্তে পেয়ে রত্নপুরে খুঁজতে আসা। কেন না, রত্নপুর পাশাপাশি গ্রাম, নদী এখানে এসে সে লুকিয়ে থাকে। এইজন্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর স্বয়ং দলবল সহ তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে; কিন্তু কৃতকার্য হইল না। অবশেষে শুনা গিয়াছিল, রত্নপুরের দীঘির পাড়ে সে লুকিয়ে বসেছিল—তখন ধরা পড়ে। সেবার চারি বৎসর কাটক হয়।





আলোচনা—৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন।

বঙ্গ দুর্গোৎসব।

দেখিতে দেখিতে সপ্তসর অতিবাহিত হইল, আবার সেই সুখের শরৎ সমাগম, সাধের আশ্বিনে আবার সেই শারদীয়া পূজার শুভ আয়োজন; বহুদিন পরে ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী আবার উদ্বোধিত হইয়া মহামায়ার পূজার জন্ম লালারিত। চিরকাল এই সময়ে—এই সুখের শরৎ সমাগমে বঙ্গবাসী সুরপুরের আরাধ্যাদেবী জগদ্ধননী, আনন্দময়ীব পূজার জন্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহা বাঙ্গালীর চিরভাষ্য। এ বিশ্বব্যাপী আনন্দে তাহারা চিরকাল সমানভাবে যোগদান করিয়া আসিতেছে। মাতৃপূজার আনন্দ তাহাদের শিরায় শিরায় সংবদ্ধ,—তাই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপনহারা হইয়া বিশ্ব-জননীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে,—চির ভূষিত বাঙ্গালী উৎকণ্ঠিত ভাবে আশাশয্য চাহিয়া আছে। আজ সম্মানবৎসলা জননী বঙ্গভবনে আসিতেছেন।

বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকারময় আকাশ মেঘ বিনির্মুক্ত হইয়া অতি রমণীয় পবিত্রাদপি পবিত্রভাবে সুসজ্জীভূত হইয়াছে। গভীরাবর্তময়ী ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল কলনাদিনী স্রোতস্রতীর আর দেবপু রঞ্জিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোররবা বীচিমালা আব দুর্দমনীয় বেগে দ্রুত ভাঙ্গিয়া লোকের সর্বনাশ করিতে ছুটিতেছে না। শরৎ সমাগমে স্রোতস্রিনী মলিনের আর সে মালিন্য নাই, সেই ভীমাভয়ঙ্করী মূর্তি এখন প্রশমিত হইয়া প্রশান্ত কোমলভাবে ধীরে ধীরে প্রবাহিত। দীন মলিনা প্রকৃতি-সতী আবার রাজরাণী হইয়াছেন, নয়নমনোহর স্নমধুর সাজে সজ্জিতা হইয়া মানবমনে অপার আনন্দ ঢালিয়া দিতেছেন। শরতের শ্রামল শস্তপূর্ণ বহুঙ্কর্য সুনির্মল অনন্ত নীলাকাশ-জগতে জগদম্মার আগমন ঘোষণা করিতেছে। শরচ্ছত্রের সুনির্মল জ্যোৎস্নারশি সহস্রধারে সূধ্য বিতরণ করিয়া মহিমাময়ীর মহিমা কীর্তন করিতেছে। শরদ-শিশির-সিক্ত কুসুমাবলী কান্তারে প্রস্ফুটিত হইয়া অতুলনীয় শোভা বিকীরণ করিতেছে।

প্রকৃতির এমন শোভা, এরূপ অকৃত্রিম আনন্দময় ভাব, এই সাধের আশ্বিনে সুখের শরৎকাল ব্যতীত আর কোন্ কালে থাকা সম্ভব?

অনন্দময়ীর অহুপম অনন্ত শোভা রাশি, বিশ্বরচিতার এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য :—আনন্দময়ীর আগমনে নিরানন্দ বঙ্গগৃহের এ অসীম আনন্দ বিনিমিত। এখন যে দিকে যাও, যে দিকে চাও, সকল স্থানেই স্তূপের উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গে ভঙ্গে ছুটিয়াছে; গীতবাত্ত আনন্দধ্বনি পরিপ্লুত হইয়া বঙ্গবাসী উৎসবামোদে মত্ত হইয়াছে। এই কয়দিনের জন্ত নিরানন্দময় বঙ্গভূবন আনন্দময় হইয়াছে; আনন্দময়ীর শুভ পদার্পণে নিরানন্দ যেন বঙ্গদেশ ছাড়িয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। সদানন্দের আনন্দদায়িনী বিশেষধরীর আগমনে আর কোথাও নিরানন্দেব লেশমাত্র নাই, জগৎ আজ শোভাময়, আনন্দময়।

আজ বাঙ্গালীর সামান্য দরিদ্রের গৃহে বালক-বালিকাগণ সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, গৃহিণী বহুদিনের পর কুন্তলগুচ্ছ তৈলাক্ত করিয়া, সীমস্তে সিন্দূর-বিন্দু স্তূষোভিত করিয়া, যেকপ আনন্দ অহুভব করিতেছে, তাহার পবিত্র হৃদয়-কন্দরে যে আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে, হে দিগ্বিজয়ী সম্রাট ! তোমার সমাগরা সাম্রাজ্যেব বিনিময়ে সে বিমল আনন্দ পাওয়া যায় কি? তোমার সাগবতুল্য ধনাগারে সে আনন্দের কণিকা আছে কি? ধনে এ আনন্দ পাওয়া যায় না,—এ আনন্দ মনে। ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী, মা আসিবেন, মায়ের রাতুল চরণ পূজা করিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ পাপরাশি হইতে পরিস্কৃত হইবে, ভবের সকল ভাবনা—সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবে বলিয়াই, তাহারা ভবভাবিনী ভবরাধ্যা জননীর পূজা করিয়া এত আনন্দ লাভ করে। ঐ দেখ, আজ মাতৃভক্ত বঙ্গবাসী মায়ের দর্শন লালসায় আত্মহারা হইয়া পূজায় ত্রতী হইয়াছে; মা মা রবে ডাকিয়া আনন্দাশ্রু বিসজ্জন করিতেছে। বালক-বালিকাগণ নব বসনে সজ্জিত হইয়া মায়ের পূণ্যময়ী মূর্তি দর্শন করিতে পূজাবাড়ী গমন করিতেছে।

আজ আশ্বিন মাসের উনত্রিংশ দিবস—দুর্গা শগুমীর শুভ বাসর সমুপস্থিত, মহামায়ার মহাপূজাব মহতী ঘটা, চিরদুঃখী বাঙ্গালীর জীর্ণমণ্ডপে আজ স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রীদেবী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইয়াছে, তাই অন্নহীন ভারতক্ষেত্রে আজ অন্নের ছড়াছড়ি। বহুদিনের পর আবার অকৃতি-সন্তান-গণকে মনে পড়িয়াছে; তাহারা আজ সকল কষ্ট, সকল দুঃখ ভুলিয়া এক-প্রাণে মাতৃসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত বঙ্গবাসী সঘৎসরের অধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া আজ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে।

বহুদিন হইতে বাঙ্গালী বিবেচনার বিশ্বরচনার গাভীর সেই সৌন্দর্য্যে
বিমোহিত হইয়া তাহার উপাসনা করিতে শিখিয়াছে; বহুদিন হইতে
বুঝিয়াছে, একমাত্র অনাচ্ছা আত্মশক্তি হইতেই সমস্ত উৎপত্তি হইয়াছে।
প্রত্যেক বাঙ্গালী সেই শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জননী বলিয়া জানে।
মা আছেন, ইহা তাহাদের ধ্রুববিশ্বাস, এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া
তাহারা চিন্ময়ী মায়ের মূর্ত্তি রচনা করিয়া পূজা করে; জগজ্জননী
অভয়ার স্নেহময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তিতরে মা মা বলিয়া ডাকে;
তপ্ত দেহ, মন, প্রাণ, মায়ের দেবারাধা স্তবীতল চরণে অর্পণ করিয়া কয়-
দিনের জন্য জুড়াইতে পারে বলিয়াই মাতৃপূজায় তাহাদের এত আনন্দ ও
এত উৎসব।

আজ তাহাদের সেই সাধ পূর্ণ হইয়াছে। সন্তানবৎসলা জননী আজ
সন্তানের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া তাহাদের মনোবাসনা চরিতার্থ
করিতে পর্ণকুটীরে শুভাসীন হইয়াছেন। চিরবিজিত বাঙ্গালীর হৃৎকল
হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইয়াছে; তাই আজ সর্বাঙ্গতা, সার্থপবতা বিসর্জন দিয়া
তাহারা মায়ের মহিমা কীৰ্ত্তন কবিতোছে। কর, বাঙ্গালী। যুগে যুগে সেই
সর্বমঙ্গলা আত্মশক্তির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা কর; মঙ্গলময়ীর রূপায় তোমাদের
প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

মা শক্তি-স্বরূপিনি। মানবের নিজের সম্পত্তি কিছুই নাই, আছ নাজ
তুমি। তাই আজ তোমার অকৃতি সন্তানগণ তোমার প্রভু থাকুল। আজ
উদরে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, শক্তিহীন হৃদয়ে শক্তি নাই, তথাপি মা
তোমার আগমনে আমরা নববলে বলীয়ান হইয়াছি, তোমার মুক্তিমুলাধার
পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আমরা ধন্ত হইয়াছি। এস মা ভবরাণি! তবতবনে
আসিয়া দরিত্রের ভবন পবিত্র কর, তোমার পদস্পর্শে দরিত্রের অন্ধকার
গৃহ আলোকিত হউক; স্বর্গের শোভারূপি চারিদিকে বিরাজ করুক। এস
মা এস, জগত-পালিনি এস, তাই পবিত্র-চিত্র সাধু বঙ্গবাসী, মাতৃপূজার
কৃতজ্ঞ সমুপস্থিত; অবহেলায় এ অমূল্য সময়—এ ছলভ সময় অতিবাহিত
করিও না। আজ আমরা ত্রিলোকের আরাধ্যধন মায়ের অভয়চরণ লাভ
করিয়াছি, এ অমূল্যধন দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইবে। তাই বলি, এস,
আজ মুখকরে ভারস্বরে ভক্তিগদগদচিতে তন্ময় হইয়া জননীর মোক্ষমুলাধার
পদে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া স্নানবজ্র সফল করি। এস তাই! হিংসা, ঘেব,

শক্তিভা তুলিয়া, মনেরসাথে অবাবিকম্বে মায়ের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই, এস, পবিত্র হৃদয়ে কৈলাশেশ্বরী বিশ্বকর্জীর অভয়চরণ শিরে স্পর্শ করিয়া বিহ্বলচিত্তে বলি ;—

“ধন্তোহং কৃতকৃত্যোহং সফলং জীবিতং মম,

আগতাসি যতো হুর্গে মাহেশ্বরী মদাপ্রসং ।”

মা ! আমরা তোমাকে কি দিয়া পূজা করিব ? আমরা অকিঞ্চন দীনহীন সন্তান, আমাদের কি আছে দেবী ! আমরা মল্লহীন, ক্রিয়াহীন, তক্তিবহীন। মা প্রসন্নময়ি ! তুমি নিজে প্রসন্ন না হইলে ত্রিলোকীতলে এমন কি জিনিষ আছে, যদ্বারা তোমার প্রসন্নতা লাভ করা যায় ? তবে তুমি নাকি সন্তানবৎসলা, ধনী সন্তানের অমূল্য রত্নরাজিতে তুমি বাদশ সন্দেহ না হও, অকিঞ্চন ভক্তের সামান্য দুর্কাদলেও নাকি তাহাপেক্ষা সহস্রগুণে সন্দেহ হও, এই জনাই মা ! আজ আমরা তোমার পূজা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। ত্রিলোকেশ্বরী ! তুমি যার প্রতি প্রসন্ননেত্রে একবার কটাক্ষপাত কর, এই ত্রিলোকে তাহার সকল অসম্ভব সম্ভব হইয়া যায় ; তাই আজ আমরা সামান্য হইয়াও তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি। এমন দিন ত আর হইবে না,—এ সুসময় দেখিতে দেখিতে ফুরাইবে। অতএব এস শাক্ত, শৈব ; গাপপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি তত্ত্বগণ ! আজ দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা এবং আমাদের “আমি” রূপ অহংজ্ঞান মায়ের রাজীবচরণে অর্পণ করিয়া ধস্ত হই এবং মাতৃগদে শরণ লইয়া বলি,—

“শরণাগত দীনাত্ম পরিভ্রাণ পরায়ণে,

সর্বদাজী হরে দেবী নারায়ণী নমোহস্ততে ।”

মা ! আমরা ভবঘোরে ঘুরে ঘুরে দিশাহারা, জ্ঞানহারা, আত্মহারা ; তাই তোমাকে তুলিয়া অসার সংসারে “আমার আমার” করিয়া অশেষ বাতনা ভোগ করিতেছি। অজ্ঞানদায়িনী জ্ঞানময়ি ! তোমার এই অভাগা সংঘারজালাভিত্ত সন্তানগণকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর। যেন আমাদের বার বার আর ভবের এই গভীরাত যন্ত্রণাভোগ করিতে না হয়।

সম্পাদক ।

পাছাপেড়ের কি বাহার !

ধন্য পাছাপেড়ে তব মহিমা অপার ।
তোমার স্মৃশ গাথা জগতের সার ॥
কোন্ শিল্পজন হয়ে কোতুকে মগন ।
অটচিতে তোমার হে করেছে স্মজন ॥
ধন্য পাছাপেড়ে তুমি ধন্য এ ধরায় ।
ভবের ভাবুক তুমি ভাবে বুঝা যায় ॥
বাঁহে হয় রমণীরা আনন্দে মগন ।
যাহার অভাবে করে বিরলে ক্রন্দন ॥
থাকে যদি স্বর্ণবালা বাজু তারাহার ।
তুমি না থাকিলে, তারা পায়
কি বাহার ॥

রেট চন্দ্রহার গোট তোমার অভাবে ।
কিরূপে পাইবে স্থান বলি তাই ভাবে
তা দেখে চরণপদ্ম করে হার হার ।
শোভাহীন হয়ে কাদে পড়িয়া ধূলার ॥
দিলে পতি ঝাপটা সিঁতি অনন্ত যশম
তোমা বিনে মনাগুনে রহিবে গরম ॥
থাকে যদি পুষ্পহার সিঁতি বাজু চিক ।
তোমার অভাবে শূন্য দেখে দশদিক ॥
হুল্লাসী যদিও হয় কিষা কৃশদেহ ।
তোমাতে সৌন্দর্য বাড়ে,
নাহিক সন্দেহ ॥

ধন্য পাছা, ধন্য তুমি, ধন্ত এ ধরায় ।
করিয়া তোমার গুণে মোহিত সবার
ধন্য পাছা ধন্য তুমি রমণীমোহন ।
কে পারে তোমার শক্তি করিতে বর্ণন
বিনা তৈলে দীপ জলে, তুমিইলে ঘরে
অক্যানারী স্থখী হয়, তোমাপেলে পরে

থাকলে তুমি পরিধানে, কোন্
হুঃখ ভার !
পায় না ললনাগণে বলিব কি আর ॥
নিজ স্থান থাক যদি করিয়া দখল ।
দেখিয়া কালসর্পিনী হইয়া পাগল ॥
ভয়েতে পলায়ে যায় আপনার স্থান ।
কি আছে অধিক পাছা, এর চেয়ে
মান ॥
ধন্য পাছা, মুগ্ধ হই তোমার ঝলকে ।
তোমার বাহার দেখি
পলকে পলকে ।

ধনীর অগার কিষা দরিদ্র কুটীরে ।
আহ্লাদে মগন হয়ে
বলি ধীরে ধীরে ॥
পদ্ম পাছা হৃদ পাছা পছা ঝনাঝনী ।
আঁধারে মাণিক জলে, পাছাতে
আপনি ॥
পূর্বে নারীগণে পরি তাঁতের বসন ।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইত তখন ॥
সদাই মগন থাকি স্বামীর সেবার ।
সংসার করিত স্থখী
শান্তে শুনা যায় ॥

কখন কুমল লাগি কথা নাহি ছিল ।
বর্তমান সময়তে বত গোল হৈল ॥
থাপি বস্ত্র নিলে পরে, অঙ্গে
নাহি সয় ।
পাছাপেড়ে দিলে পরে, কত
স্থখী হয় ॥

দেখ হয় পাছা পেড়ে নিশানে

নিশানে ।

লজ্জাশীলতা যায় তোমার বিহনে ॥

আর দেখ পুরাকালে আধ্যানারীগণে

করিত যে সব সেবা হরষিত মনে ॥

এখন কোথায় উহা দেখে কয় জন ।

দেখি এবে তব নীলা ঘরে সর্বক্ষণ ॥

তোমার আকর্ষণী শক্তি, যে আছে

কিঞ্চিৎ ।

জানীকনে বুঝে তাহা, অজ্ঞানে

বক্ষিৎ ॥

মনলোভা শোভা, আর আছে আকর্ষণ

কিঞ্চিৎ বলিব তার গুন দিয়া মন ॥

শশা কি কুমরা ফল বৃদ্ধির কারণ ।

একটা আছে প্রথা জানে সর্বজন ॥

দিবা করে চূর্ণ দিয়ে শশাব উপর ।

লোকেতে স্থাপন করে মাচার ভিতর

চূর্ণ মাখাইয়া দিলে, লোকে বলে

তখন ।

নজর না দিবে কেহ ফলেতে কখন ॥

ভরিত পড়িলে চক্ষু সে চূর্ণের পানে ।

ভাবি তার আকর্ষণ, লোকে

হারি মানে ॥

সেইরূপ তুমি যার থাকয়ে পরনে ।

ঐলক্ষিতে আঁখি যায় তব আকর্ষণে ॥

নব্য ভব্য যুগা হলে ঘুরে ফিরে চায় ।

আধসি হইলে কিন্তু, চক্ষু

লাগে তায় ॥

বৃদ্ধ যারা ভাবে তারা হইয়া মগন ।

হুঃখেতে বারেক তরে করে দরশন ॥

ধন্য পাছা ধন্য তুমি কলির বসন ।

ইজ্জতে নিশান দিতে, তোমার

স্বজন ॥

কিবা মনলোভা শোভা, তোমা

হইতে হয় ।

কুরুপা রূপসী হয় তব মহিমায় ॥

উদরের একবেলা করিয়া সংস্থান ।

তোমারে লইতে হইবে,

রাখিবারে মান ॥

নতুবা ঘরের গ্লিগ্লি, ফেলাইবে ফেঁরে ।

গৃহকর্ম লোকাচার সব দিবে ছেড়ে ॥

তখন মনেতে হায়, প্রমাদ গণিয়া ।

ছুটে যায় টাটু প্রায়, তোমার

লাগিয়া ॥

তুমি গৃহে এলে পর,

গ্লিগ্লি ছুটে তারপর,

আমি তোমা করে দরশন ।

মনেতে হইয়া স্থির,

আনন্দে হয়ে অধীর,

যতনে করয়ে পরশন ॥

দূরে যায় হুঃখ ভার,

দেখিয়া তব বাহার,

ধন্য ধন্য তোমার গঠন ।

শতক তোমার নাম,

স্মরণে পুরয়ে কাম,

গৃহে হয় শান্তির স্থাপন ॥

শ্রীকালিব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় ।

আর্য্যাপন্থী সম্প্রদায়।

আজ আমরা সভা হইয়াছি। দাসত্বের তীব্র কশাঘাতে, এবং চর্খ-পাদ্রকার গুরুভারে পৃষ্ঠ ক্ষীণ হইলেও আজ আমরা সাহিত্য বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায়, বুদ্ধ পিতামাতার অর্থহীন উপদেশ বাক্যাবলীর অসারতা প্রতিপাদন করিয়া—

“সভার সমক্ষে বলি

‘হণ্টারের’ বংশাবলী,

জানিনে দাদার নাম কি গোজ তাঁর।”

যে ব্রাহ্মণগণ এককালে ভারতবর্ষে সর্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইত; যাঁহাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে ব্রহ্মতেজস্বিত উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইত;—আজ তাঁহারা দীনহীন—লাঞ্ছিত এবং স্বজাতি কর্তৃক ঘৃণিত। আজ আমরা পুরোহিত বলিলে কেবলমাত্র ‘দক্ষিণা’ ও ‘আতপতগুল-লোভী’ টিকিধারী ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করি। দেবদ্বিজে আর আমাদের ভক্তি নাই, তাই আজ আমরা এত দুর্জল—এত আসার এবং পরপদদলিত।

রাজপুত রাজকুমারগণ বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বে জীজ্ঞাতির সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে পারিতেন না; বিংশতি বৎসরের পূর্বে তাঁহাদের বিবাহও হইত না। হাস্যবিলাস কাহাকে বলে, পরিণয়ের পূর্বে তাঁহারা তাহাও জানিতেন না। উদয় সিংহ যদিও ঐ প্রকার জাতীয় প্রথাভঙ্গারে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সংসারে প্রবেশ করিয়া, তিনি সেই স্ত্রীনীতিকে পদদলিত করিলেন। তাঁহার সপ্তবিংশতিটি রূপ-বতী মহিষী ছিল। তথাপি পরজীর প্রতি ভয়ঙ্কর আশঙ্কি। অধিক কথা কি, পিতৃরাজ্যের এক ব্রাহ্মণ কন্ডার রূপে একেবারে তিনি বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। আকবরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যে সময় তিনি নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন, সেই সময় সেই স্থলোচনা বিপ্রকুমারীর প্রতি তাঁহার নেত্র আকৃষ্ট হয়। কন্ডাটী অবিবাহিতা এবং পরমা-সুন্দরী। তাঁহার প্রেমলাভ করিবার জন্য উদয় সিংহ এককালে অধীর হইয়া পড়েন।

রূপবতীর পিতা আর্য্যাপন্থী সম্প্রদায়ভূক্ত। প্রদেশ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ

আর্যাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। অংঘাপন্থীর ব্রাহ্মণ সেই আর্যামাতার উপাসক ছিলেন। ক্রমে তিনি এই ব্যাপার শ্রবণ করিলেন। কি করিলে সকল দিক রক্ষা হয়, জাতি-কুল বজায় থাকে, অনেক চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ তাহা স্থির করিলেন।

আর্যাপন্থী ব্রাহ্মণ হোম-যজ্ঞে সুদীক্ষিত ছিলেন। প্রথমে তিনি বৃহৎ হোমকুণ্ড খনন করিয়া স্বহস্তে প্রাণাধিকা কুমারীর প্রাণসংহার করিলেন। তাহার কমনীয় কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ দেহের এক-খণ্ড মাংস সেই সকল মাংস খণ্ডের সহিত মিলিত করিলেন, তাহার পর মন্ত্রপাঠ পূর্বক হোম আরম্ভ করিয়া দিলেন। হোম সমাপ্তির পর সেই মাংসখণ্ডরাশি হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। হোমায়ি তরঙ্গর প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ভীষণ হতাশন শিখায় এবং তদ্ব্যবহিত অন্ধকার ধূমে চতুর্দিক সগচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই অগ্নিকুণ্ড সমীপে উপবেশন পূর্বক রাজা উদয়সিংহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, “অদ্য হইতে রাজা উদয়সিংহের সমস্ত শাস্তি বিলুপ্ত হউক, এই সময় হইতে তিন প্রহর, তিন দিবস অথবা তিন বৎসরের মধ্যে আমার প্রতিহিংসা সফল হউক।” উদয়সিংহকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিজ প্রাণোপমা নন্দিনীর দহমান মাংস রাশির উপর প্রফুল্লবদনে নিপতিত হইলেন। ক্ষণেকের মধ্যেই ব্রাহ্মণের জলন্তদেহ ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ, ব্রাহ্মণের অভিশাপ অমোঘ, ব্রাহ্মণের মনঃপীড়া সংসারের সৰ্ববিপদের আমন্ত্রক। রাজা উদয়সিংহ সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে জীর্ণশীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের মুখবুর্কালীন উচ্চারিত নিদ্বারিত সময় মধ্যে অতি শোচনীয়রূপে বিগতাস্থ হইলেন।

ইহা গল্প বা উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কাল্পনিক ইতিহাস নহে—ইহা সম্পূর্ণ সত্য ও অলঙ্ঘ্য। মহামতি টড সাহেব লিখিয়াছেন যে, যদি কোন রাজা অথবা রাজকুমার নিতান্ত ইন্দ্রিয়দাস হইয়া এককালে কলুষিত চরিত্র হইয়া পড়িতেন, বাহাদুর চরিত্র সংশোধনের অগ্র আশা থাকিত না, ঐ আর্যাদেবীর উপাসক আর্যাপন্থী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহার চরিত্র সংশোধন করিয়া দিত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাহন্তা।

এদিকে ঘোষাল মশাই কিছু নয়ম হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “পুলিসের ইন্সপেক্টর যখন মজুমদার মহাশয়ের বশীভূত, তখন আর বাড়াবাড়ি করিবার আবশ্যক নাই। এখন শুভকার্য্য সম্পাদন হইলেই ভাল; আব কোন প্রতিবন্ধক দিব না। কি জানি, শেষে অপদৃষ্ট হইতে হইবে। তবে কি না, এক হাজার টাকা—কম তো নয়! টাকার মায়া বড় মায়া। এক টাকা—ছোট টাকা নয়, এক হাজার টাকা। এ টাকা কেমন করে ছাড়িয়া দিই, এ তো মহাসঙ্কট, কি কার?” এমন সময়ে নবাব আসিয়া বলিলেন, “আর কেন মশাই, একজন ভদ্রলোককে কষ্ট দেন। দেখুন, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী, কেহই থাইতে পাইতেছে না। ওদিকে খাদ্য-সামগ্রী লুচি তরকারি সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এখন যদি আপনি শুভকার্য্যে মত দেন, তা হলেও সব গোলমাণ থেমে যায়। ওদিকে মেয়েছেলেরা একেবারে বিষন্ন। আপনি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ব্যক্তি হয়ে এমন বিপদ আন্বেন তা আমবা একবারও ভাবিনি।”

ওদিকে বর হরবিলাস কিছু বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বর মনে মনে ভাবছে, “বাপ্ তো টাকা টাকা করিয়া অস্থির। উনি টাকা না পাটলে আমার বিবাহ দিবেন না। এখন আমি কি করি? কোন্ কূল রাখি? যদি বাপের অমতে বিবাহ করি, তবে তিনি আমার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হবেন। আর যদি তাঁর অপেক্ষায় থাকি, তবে এই ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের আশা একেবারে পরিত্যাগ করতে হয়। আর জীবনের মধ্যে এ খটকা চিরকাল থাকিবে। যখন সমস্তই ঠিক, তখন এ বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া আমার বিবেচনায় অন্যায়। যদি পিতার অমতে বিবাহ করি, তিনি আমার উপর রাগ কব্বেন, কিন্তু সেই রাগ কি চিরকাল থাকিবে? তা আমার বোধ হয় না। তবে কেন আমি একবার নেড়ে চেড়ে দেখি না।” ঠিক এই সময়ে শিরীষ আঁপিত বরের নিকটে আসিয়া বলিল, “দেখুন, আপনি মুখ তুলে না চাইলে ভদ্রলোকের মেয়ের লজ্জা সর্ব্ব সম্বয়। আপনি যদি সম্মতি দেন, তবে শুভকার্য্য সম্পাদন হয়।”

বর। আমার কোন আপত্তি নাই, পিতাকে রাজী করান।

নাশিত। আপনি ভদ্রলোকের জ্ঞানসম্মত রক্ষা না করলে, এ সময়ে আমি কে রক্ষা করবে? ঘোষাল মশাই কিছুকণ পরে তাঁত্তা হলে “আর কত রাগ থাকবে না।

হরিবিলাস শেষে বাপের অমতে বিবাহ করিল। ঘোষাল মশাই তাতে কিছু বিরক্ত হইলেন। তবে নানা মূনির নানা মন্ত প্রকাশ হইল।—

১ম ব্যক্তি। যেমন ঘোষাল গোলমাল করেছিল, এখন ঠিক হয়েছে। আজ-কালকার দিনে এমন না হলেও হয় না।

২য় ব্যক্তি। আজকালকার দিনে বাপের কথা ছেলে পিলে মানে না। এমন বিয়ে না করাই উচিত ছিল। বাপের অমতে কাজ করা ভাল হয় নি। হাজার হোক, বাপু তো বটে।

৩য় ব্যক্তি। বেথে দিন মশাই বাপ। যে বাপু বিয়ে দিতে এসে এমন গোলযোগ করে, সে বাপের কথা কি শুনতে আছে? কথায় বলে—

“বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং আপদকালে হি উপস্থিতে।

সর্বত্র এবং বিচাবে কৃতে ভোক্তনে অপি অপ্রিয়জনম্॥”

নবম পরিচ্ছেদ ।



অনেকেই ভাবিয়াছিল, যখন বিবাহের পূর্বে এত গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে, তখন স্ত্রীপুরুষ যে স্থখে সংসারবাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে, এমন তো বোধ হয় না। কামিনীর খবর নিশ্চয় একটা গোলযোগ ঘটাইয়া কামিনীর ইহ-জীবনের সুখের মূলোৎপাটন করিবে। কামিনী স্বামী-গৃহে সুখে ঘরকন্না করিবে, এ আশা করা বৃথা। কামিনীর কপাল ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। কামিনীর বাপু নজুমদার সদাই বিমর্ষ। তাহার একটীমাত্র কল্পা—তার বিবাহ সুখশান্তিতে ও নির্বিরোধে সম্পন্ন হইল না, ইহা অপেক্ষা আর ছুখের বিষয় কি আছে? কামিনীকে একেবারে জলে ফেলে দেওয়া ইহ-রীতি। তাহার স্বামীসুখ আব ইহজন্মে হইবে না। বাস্তবিক কথা—একটা মাত্র মেয়ে, তাকে এক প্রকার চিরনির্কাসন করা হইয়াছে।

যদিও নানা প্রকার অনিষ্টজনক চিন্তা কামিনীর সম্বন্ধে উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু কামিনী খবরবাড়ী ঘাইবার পক্ষ হইতে তথায় সুখিনী হইয়াছিল। স্নানভাষণ ঘোষাল যখন দেখিল, তাহার সন্তান হরবিলাস বৌমাকে খুব মন্থ করে, তাহাকে সুখিনী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে, তখন কোন ক্রমে

তাঁহাদের স্নেহের কটকট হই, এই চিন্তা করিয়া, তাঁহার মনে এক অতুত পূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। তাঁহার মনে যে সকল ক্রোধের ভাব ছিল, সে সকল তিরোহিত হইল, এবং একমাত্র সন্তানের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হরবিলাস কামিনীর সদ্যবহাবে ও নম্রশীলতায় অত্যন্ত সুখী হইলেন। হরবিলাস দেখিলেন যে, কামিনী তাঁহার স্নেহবর্দ্ধনের জন্য সদাই রত। বাস্তবিক কামিনী হরবিলাসের মনস্তৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন। এ শিক্ষা কামিনী কোথায় পাইল? কামিনীর শাস্ত্রী নাই যে, তাঁহার নিকটে শিখিবে। তবে কাহাব নিকট এমন সুশিক্ষা পাইল? প্রথমতঃ, কামিনীর মাতাই কামিনীর প্রধান শিক্ষয়িত্রী। দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী সরোজিনী। সরোজিনী দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়ী হইতে গৃহে আসিয়া এমন কতকগুলি সংশিক্ষার পরিচয় দিল যে, তাহাতে পাড়ার যতগুলি মেয়ে তাহার সহিত মেশামিশি কবিত, তাহাদের উপকার হইয়াছিল। সরোজিনীর প্রশংসা আর ধরে না। হরবিলাস দেখিলেন, কামিনীকে পাইয়া প্রকৃত বহুলাভ করিয়াছেন। সংসারের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীই বনিষ্ঠবদ্ধ আর কে হইতে পাবে? স্ত্রী এমন বদ্ধ যে, স্বামীই স্নেহে সুখিনী ও স্বামীর হৃদয়ে সুখিনী। কামিনী হরবিলাসের তরুণ বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যদি জীর নিকটে মনের কথা, মনের স্নেহ, মনের হৃদয় প্রকাশ না করিতে পারা যায়, তবে স্বামীর পক্ষে আর দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পাবে? আর সেই স্বামী অপেক্ষা সংসারে আর সুখী কে আছে?

বিবাহের পর কিছুদিন গত হইলে, একদিন কামিনী ও হরবিলাস কথোপকথন করিতেছিলেন। হরবিলাস বলিলেন, “আমাদের দেশে রমণী-দিগকে নিয়মপ্রণালী শিক্ষা দিবার যে সকল প্রাচীন প্রথা আছে, সেগুলি অতি উত্তম। যেমন মনে কর—ঘোমটা দেওয়া। কামিনীদিগের এটা একটা প্রধান আত্র।”

কামিনী। ঘোমটা দেওয়া আবশ্যিক বটে; কিন্তু সব সময় দেওয়া যায় না। যখন বাড়ীতে কাজকর্ম করবো, তখন আর ঘোমটার দরকার কি? তবে যখন কোথাও বেতে হবে, তখন ঘোমটা দেওয়া ভাল, কেন না, তা হলে সুখ আর কেউ দেহতে পাবে না।

হরবিলাস। ঘোমটার আর একটা বিশেষ আবশ্যিকতা আছে। যদি পুরুষের

মত ক্রমাগত মাথা খোলা থাকে, তবে জী ও পুরুষে প্রভেদ কি ? এবং জীলোকদিগের লজ্জাশীলতার পরিচয় কৈ ? মনে কর, তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছ, আর কতকগুলি পুরুষ সেই স্থান দিয়া চলিয়া বাইতেছে, যদি তুমি ঘোমটা টানিয়া না দাও, তবে পুরুষেরা তোমায় কি বলিবে ?

কামিনী । পুরুষেরা ভাবিবে, আমি কোন ভদ্রঘরের ঘরনী নই । যদি তাহা হইতাম, তবে লজ্জাশীলতার পরিচয় দিতাম ; অর্থাৎ ঘোমটা দিতাম ।

হয় । হাঁ, ঠিক কথা । আমাদের দেশের মহিলাদিগের এত উন্নতি হয় নাই যে, তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত এক রাস্তা দিয়া ঘোমটা খুলিয়া চলা ফেরা করিবেন । যদিও কোন কোন পুরুষ তাহাই ভালবাসেন সত্য, কিন্তু অতদূর বাড়'ড়াড়ি ভাল নয় । তাহাতে আমাদের দেশের জীলোকদিগের অনিষ্ট আশঙ্কা অধিক ।

কামিনী । পরপুরুষের সঙ্গে মেশামিশি করা কি ভাল ?

হয় । আমি একটা জীলোকের বিষয় শুনেছি । তিনি আমার মত বি-এ পাস করা । কিন্তু বি-এ পাস করিবার পূর্বে তাঁর বিবাহ হয় । বিবাহ হয় একজন সাদাসিদে বাঙ্গালীর সঙ্গে । ছঃধের বিষয়, সেই বাঙ্গালী ইংরাজি এক প্রকার জানিত না । কাজেই সেই বিজ্ঞাবতী মহিলার কতকগুলি গুণধর পুরুষবন্ধু জুটিল ।

কামিনী । অমন বিজ্ঞাবতীর মুখে আশুন ।

হব । শেষে তাহাই দাঁড়াইয়াছিল ; সেই বিজ্ঞাবতী কখন রন্ধন করিতে পারিতেন না । কিন্তু একদিন সখ্ হইল, তাঁহাব পুরুষবন্ধুদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন । তিনি ইতিপূর্বে কখন রন্ধন করেন নাই । যখন কয়লার আশুন খুব জলিয়া উঠিয়াছে, তিনি লুচি ভাজিবার জন্য এক কড়া ঘৃত সেই উত্তুনে ঢাপাইয়া দিলেন । কিছুক্ষণ পরে সেই কড়া শুদ্ধ ঘি জলিয়া উঠিয়া বিজ্ঞাবতীর আঁচলের কাপড় ধরিয়া যায়, শেষে জ্বালীবেচারি বিপদ দেখিয়া বিজ্ঞাবতীকে অর্দ্ধদণ্ডাবস্থায় রান্নাঘর হইতে বাহির করেন ।

কামিনী । অমন লেখাপড়ায় স্মৃতি কি ? বিদ্যাবতীর মা বাপ কি উদ্দেশ্যে মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন ? তাঁহাদের কি টাকা রাখিবার আশংকা ছিল না ?

হয় । আর একটা রমণীর বিষয় বলি শুন ;—ইনিও বিদ্যাবতী ।

পুরুষবদ্ধ ছুটিয়া যায়। স্বামীবেচারি গোবেচারি। সৰ্কদাই বিদ্যাবতীর ছকুম—এ আন, সে আন, ও আন। কিন্তু স্বামীবেচারির মুখে কথাটা নাই। স্বামী সরকারী আফিসে কাজ করিত ও প্রায় চারি কুড়ি টাকা মাসিক বেতন পাইত। কিন্তু তাহাতে কি হয়, বিদ্যাবতী তাহাতে স্ত্রী নন। বিদ্যাবতী পুরুষবদ্ধদিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে ভালবাসিতেন। অবশেষে স্বামী একদিন কাছারি গিয়াছে, এমন সময়ে এক পুরুষবদ্ধর সহিত বিদ্যাবতী কুলের বাহির। পাঁচ সাত বৎসর পরে স্বামীবেচারী তোমার মত এক রমণীকে আবার বিবাহ কোরে তবে স্ত্রী হয়। তার পর আরও দশ বৎসর চলিয়া যায়। সেই বিদ্যাবতী ছেঁড়া ন্যাকড়া পোরে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে। গলিত কুষ্ঠে শরীর পূর্ণ। একদিন দৈবক্রমে স্বামী জী উভয়ের দেখা। তখন ঐ নারী তাঁহার পায়ে প'ড়ে কঁাদতে লাগলো। আর কঁাদলে কি হবে? পুরুষটা বলিল, “মনে কয়ে-ছিলাম, তোমার মত বিদ্যাবতীকে লইয়া স্ত্রী হ'ব, কিন্তু তুমি তোমার নিজেয় স্ত্রীর কণ্টক হলে। এখন আমি পুনরায় বিবাহ কোরে বেশ স্ত্রী আছি, তোমার ভোগ তুমি ভোগ।” শেষে সেই জীলোকটা অশেষ যত্নগা ভোগ করিয়া মরিয়া যায়। শুনলে বিদ্যাবতী কাহিনী?

কামিনী। ও কথা শুনে মনে বড় দুঃখ হয়। কেনই বা তাদের এমন দশা হয়? স্বামী থাকতে পরপুরুষের মুখ দেখার টাইতে কি পাপ আছে? সে পাপের ভয়ানক ফল। এখন যাই, অনেক কাজ আছে।

দশম পরিচ্ছেদ ।

কামিনী একশে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। খণ্ডরবাড়ীর স্ত্রীশ্রীতি ও স্বামীর সদ্যবহার শুনিয়া, রত্নপুরের মহিলামহলে সকলেই সন্তুষ্ট ও স্ত্রী। সকলের মনের কুসংস্কার একেবারে তিরোহিত হইল! পাড়ার গোপালের মা গ্রামের গিন্নীদের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান। গ্রামের সকলে গিন্নীদিদি বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া থাকে। চুলগুলি পরিপক, বেন শোনের স্ত্রী। এখন সর্বোচ্চিনী তিন মাসের। তখন তাঁহাকে পজিহীন হইতে হয়।

গোপালকে কলিকাতায় পাঠাইয়া লেখাপড়া শিখান। হাতে হু পয়সা আছে। ভবিষ্যৎ এক প্রকার মন্দ নয়। তিনি বিধবা, 'কাজেই মাংস বা মাছ খান না। তবে গোপাল ও সরোজিনীর জন্য মৎস্য রান্না হয়, কিন্তু এক হাঁড়িতে নয়, ভিন্ন হাঁড়িতে। বাড়ীতে এক বুড়ী কি আছে। সে গোপালকে খুব ভালবাসে। সেই গোপালের মনস্তত্ত্বের জন্য মাছ রান্না দিতে আপত্তি করে না। তবে গোপালের কেবল মাছেই তৃপ্তি হইত না। সে পাঠার মাংস খাইতে বড় ভালবাসে, কিন্তু বাড়ীতে পাঠার মাংস রান্না দিতে কে দিবে? গোপাল সে কথা নাকে অনেকবার জানাইয়াছিল, কিন্তু গোপালকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন, “বাবা, আমরা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবেরা কখন মাংস খায় না। তাতে আবার আমি ওসব ছুঁই না, কেমন করিয়া তোমায় রান্না দিই, বাপ? বুড়ী কি তো বাঁধতে জানে না, তা হলেও যা হ'ক হতো।” কাজেই গোপালকে নিরন্তর থাকিতে হইত। কিন্তু কয় দিন? গোপাল নিজেব জোগাড় নিজেই করিয়া লইল। মজুমদার মশাই ও বিষয়ে খুব পরিপক্ব লোক। তিনি গিল্লীব কাছে তাড়া খাটতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সহস্বে পাক কবিত্তে পারিতেন। কাজেই গোপাল বাড়ী আসিলে উভয়ে মিলিয়া আরাম করিয়া রসনা পবিত্র করিতেন।

অ্যা!! কি বলেন গ্রহকার মশাই? মজুমদার সহস্বে পাক করিয়া খাইতেন? ছি—ছি—ছি!!! আপনি কি ভদ্রসমাজে কখন বাস করেন নাই? আপনি কি সভ্যজগতে ভ্রমণ করেন নাই? নভেল লিখতে বসে ভদ্রভদ্র জ্ঞান আপনার লোপ পেয়ে গেছে? ভদ্রলোকে কি সহস্বে পাক করে? একথা কখন শুনা যায় না, আর এমন ঘটনা হতেও পারে না? আপনি নভেল লেখা রেখে ঐ কাজ করুন গিয়া! আপনার নভেল লেখা কর্ম নয়। আপনার বোধ হয় এই হাতে খড়ি, তাই এমন ঘটনা সাহস করিয়া উল্লেখ করিতেছেন। অথবা আপনার পাঠা আপনি যদি ল্যাজের দিকে কাটেন, তাতে আমাদের কি? কা কস্য পরিবেদনা—আপনার বোড়া আপনি যদি ল্যাজের দিকে চড়েন, তাতে কার কি? তবে আমরা দর্শকবৃন্দ, পাঠক-বৃন্দ—কাজেই “দেখতে নারি চলন বাঁকা।” তবে যা তা লিখে আপনি কাগজ পোরাচ্ছেন, কাজেই আমরা হু-চার কথা নু ব'লে থাকতে পারি কৈ? আপনি শুধুন আর নাই শুধুন, আমাদের কর্তব্য স্বাক্ষর

আমরা করলাম, এখন আপনার যা অভিকচি হয়, তাই করুন। তবে ভেবেছিলাম, আপনার পুস্তকখানি পাঠ করবো, কিন্তু যে প্রকার আমাদের অপবাদ আপনার গ্রন্থে রটনা করতে আরম্ভ করেছেন, তখন আর কেমন ক'রে সাহস কবি? দেখুন, আমরাই আপনার গ্রন্থ সম্বন্ধে যে মন্তব্য দিব, তাহাই সাধাবণে গ্রহণ কব্বে, ও তাহাই লোকে বুঝ্বে। অতএব ঐ অপযশের কথা লিখ্তে কাস্ত হন,—কাস্ত হন, কাস্ত হন!!!

এক বিপদ। গ্রন্থ লেখায় কি বিপদ—সবে আরম্ভ কবেছি, এখনি এতো বাধা, না জানি শেষ কব্বে, আরও কত কি কথা উঠ্বে, আর শেষ করতে পাববো কি না, তাই ভাবছি। যদি মন দমিয়া যায়, তবে আর এগুবো কোথা পৌঁকে? যে ঘটনায় আপনাদের উৎসাহ হবে, আমার গ্রন্থের দিকে বিশেষ টান থাক্বে, আমি তাহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘটনাটী আরম্ভ কবলাম। যাতে আপনাবা সন্তুষ্ট হন, আমার পাঁচখানা নভেল কাটুতি করে দেন—না আমাব উপবে চটে লাল। তবে আমি দাঁড়াই কোথা? ওগো! বলে দাও আগায়—কার ছয়ার ধব্বো? আপনাবা সমুদয় কথাটা ত তলিয়ে বুঝলেন না, আমার অর্দ্ধেক কথা নভেলে—আর অর্দ্ধেক কথা পেটে; আব আপনাবা বিচার নিস্পত্তি করে বসলেন। এমন মজার বিচার তো দেখিনি। তবে সম্পূর্ণ কথা শুনে যে স্মৃতিতির আশা ক'রাম, তাও গেল। কেন না, এখন আপনাবা বিচার নিস্পত্তি করিয়াছেন। আমাব পেটের কথা খুলে বল্বে কি আর নূতন ক'বে বিচার কব্বেন? তাতে কি আব কোন আশা থাক্বে পারে! না—আমায় সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। কিন্তু আমি কেমন করিয়া পেটের কথা চেপে রাখি। যেন তেন প্রকারেণ আমি তো আব কথা লুকিয়ে রাখ্তে পাববো না। আমাব পেটের কথা প্রকাশ হবেই হবে। আমার ব্যক্ত্যবাটা শুন্ন। মজুমদার মশাই নিজ হস্তে মাংস রন্ধন করেন। এটা তাঁর পক্ষে স্মৃতিতির কথা। প্রথমতঃ মজুমদার মশাই এমন জিনিস স্বহস্তে রন্ধন করেন, যে জিনীস গ্রামেব মধ্যে মজুমদার মশাই ছাড়া রন্ধন করিতে পারে এমন কেহই ছিল না। লোকেরা মাংস ছাড়া নিরামিষ ও আমিষ রন্ধন করিতে উপযুক্ত ও পটু, কিন্তু মাংস রন্ধনে সৰ্ব্বতোভাবে অপরক। যদি বলেন, মাংসাহারে দরকার কি? হাঁ! একথা বল্বে পারেন—একথা স্মৃতিযুক্ত। কিন্তু সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। আপনাবা

যখন পুঁই শাকের চড়্‌চড়ি রন্ধন করিয়া ও স্বয়ং সেই পদার্থ আহার করিয়া কত খুসী ও সুখী হন, তখন কর্তার প্রাণের গথটুকু কেন না মেটে? তাঁকেও তো কিছু প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। সেই জন্ত মজুমদার মশাই মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ গোপাল আসিলে, পরমানন্দে স্বহস্তে পাক করিয়া ও ভোজন করিয়া আপ্যায়িত হন। দ্বিতীয়তঃ, মজুমদার মশাই আপনাদের কতক পরিশ্রম লাঘব করেন। যদি মজুমদার মশাই মাংস রন্ধন করিতে অপটু হইতেন, আর যদি আপনি মাংস রন্ধনে প্রস্তুত থাকিতেন, তবেই দেখুন, আপনাকে মজুমদার মশাই ওরফে আপনার কর্তার জন্য পরিশ্রম করিতে হইত। তখন “অধিকন্তু ন দোষায়” বলিতেই হইত। তখন হয় ত বলিতেন, “কি করি, কর্তা মাংস খান, আর যখন রাঁধিতে জানি, তখন কি বসিয়া থাকিতে পারি? যদিও মাথা ধরিয়াছে, হাত পা জালা করিতেছে, পিঠ বেদনা করিতেছে, আগুনে থাকা নয় না, আজ অনেকগুলি তরকারি রন্ধন করেছি, আর মাংস রান্না সম্ভব নয়, আজ অনেক কাজের ভিড়—কেমন করে অনেককণ ধরে হেঁসেলে বসিয়া থাকি—এসব ওজর আপত্তি তখন খাটিত না। তৃতীয়তঃ, আমার উপর তো ক্রোধ করিয়াছেন, সে ক্রোধ লাঘব করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি গরিমসী গ্রহকারের ক্ষমতা ও যোগ্যতা নাই। কিন্তু কর্তাবাবু যখন বিদেশে চাকরি করিতে যান, তখন তো আপনি সঙ্গে থাকেন না, বাবুর দশা কি হবে? বাবুর হোটেলের কিছা মেসে থাওয়ায় রুচি হয় না। তবে বাবুর উপায় কি? তবে সহরের বাবুদের মধ্যে প্রায় সঙ্গে চাকর বা রাঁধুনি থাকে। কিন্তু সকল বাবুর তা জুটে উঠে না। তাদের দশা কি হবে? বাবুর বেতনে রাঁধুনি রাখা কুলিয়ে উঠে না, তখন উপায় কি? কাজেই বাবুকে স্বহস্তে পাক করতে হয়।

একজন ডাক-বাবু ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে মজুমদার মশাইয়ের কথাবার্তা হয়।

মজুম। আপনি স্বহস্তে পাক করেন কেন? একজন রাঁধুনি রাখিলেই পারেন?

ডাক-বাবু। কি জানেন, নিজে পাক করে খেয়ে যত রুচি হয়, পরের হাতে তত রুচি হয় না।

মজুম। আপনি ভদ্রলোক, মানসম্মত আছে, আপনার স্বহস্তে পাক করা ভাল দেখায় না।

১৩১১ সাল । আলোচনা । নবম সংখ্যা ।



দীনেশ
স্বাক্ষর

৬৪ 345-
৫

সম্পাদকীয় মন্তব্য ।



বিজয়ার সম্ভাষণ ।—চির প্রথানুসারে আমরা আলোচনার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীবর্গকে যথাযোগ্য নমস্কার, আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ ও সাদরসম্ভাষণ করিয়া পুনরায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম । তাঁহাদের অনুগ্রহে এবং না বিশ্বজননীর রূপা কটাক্ষে আমরা যেন কর্তব্য-পথ-স্থানিত না হই ইহাই প্রার্থনা ।

নিবেদন ।—আমরা ক্রমাগত ছয় মাস ধরিয়া গ্রাহকগণের নিকট আমাদের ১৩১১ সালের আলোচনা নিয়মিতরূপে পাঠাইতেছি, কিন্তু অদ্যাবধিও অনেক গ্রাহকের নিকট হইতে আলোচনার বার্ষিক সাহায্য বা ভিঃ পিতে পত্রিকা পাঠাইবার অনুমতি পত্র পাইলাম না । গ্রাহকগণের রূপাদৃষ্টির উপর পত্রিকার স্থায়ীত্ব নির্ভর করিতেছে । আমরা গ্রাহকগণের নিকট হইতে আট বৎসর যেরূপ রূপা লাভ করিয়া আসিতেছি, আজকাল তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে দেখিয়া বড়ই হুঃখিত । এক্ষণে গ্রাহক মহোদয়গণ অনুকম্পা পুরঃসর স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া আমাদের চরিতার্থ করিবেন ; অথবা ভিঃ পিতে সোপহার পত্রিকা পাঠাইবার অনুমতি প্রদান করিয়া আমাদের বাধিত করিবেন । সপ্তাহ মধ্যে কোনও উত্তর না পাইলে আমরা আর অপেক্ষা না করিয়া উপহার ভিঃ পিতে পাঠাইব । কেহ যেন ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদের অথবা ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, ইহাই অনুরোধ ।

উপহারের প্রশংসা ।—এবার আমাদের বিশ্ব বিমোহন উপহার একটা উত্তম সময়-রক্ষক টাইমপিস্ ঘড়ি । বাজারের ঘড়ির মত ইহাতে বাজে পরমা নষ্ট হইবে না, গ্রাহকগণের মনোরঞ্জননের জন্য আমরা ছইবৎসর গ্যারান্টি দিয়া থাকি । ঘড়ি সম্বন্ধে স্বাধীন ত্রিপুরা আগরতলা রাজধানীর রাজকুমার শ্রীযুক্ত গোপাল জিৎ দেব মহোদয় লিখিয়াছেন, “মনে করিয়াছিলাম, আলোচনার উপহার একটা যৎসামান্য ঘড়ি, কিন্তু এক্ষণে উপহার পাইয়া বড়ই আশ্চর্য্যাবিত হইলাম । বলিতে পারি না, আপনারা কেবল মাত্র ২৯/০ আনা লইয়া কিরূপে এরূপ সুন্দর ঘড়ি উপহার দিতেছেন । ঘড়িটা

বেশ সময় ব্যয়িত হইতেছে, দেখিতেও বেশ সুন্দর, কিন্তু ক্রীড়াঙ্গণের
 - উপহার অনেক কাটতি হইবে।

নূতন গ্রন্থ।—আমবা পবিত্র জক স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়
 প্রণীত “মুক্ত মাধব” নামক একখানি পাবনাগিক নাটক সমালোচনার্থ
 পাইয়াছি। নাটক সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ, কিন্তু আজকাল সেকুপ ধরণেব
 নাটক কয়খানি বাহির হইতেছে? অধুনা বঙ্গীয় বঙ্গমঞ্চে যে সকল নাটকের
 অভিনয় হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই সারাংশ বর্জিত। কিন্তু “মুক্ত-মাধব”
 সে ধরণেব নাটক নহে। ইহাতে শিক্ষা ও উপদেশ ছই আছে। প্রবীণ
 ভারতী মহাশয় পুস্তকে মাধব কুম্ভকারের চিত্র যেকুপ অঙ্কিত করিয়াছেন,
 তাহা পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইবেন। বঙ্গমঞ্চে এইরূপ নাটকের অভিনয় ওয়াই
 বাঞ্ছনীয়। দাম্বিক ধর্ম্মানন্দেব লেখনী ব জয় হউক। তিনি এইরূপ নাটক
 লিখিয়া স্নাত্তাভাব পুষ্টিসাধন এবং দেশের ও দেশেব কল্যাণ সাধনা করন।
 তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্ম্যাব নিকট আমবা অনেক আশা কবি।

ফারে অমৃতলাল।—কলিকাতা সহবে আজকাল তিন চারিটা
 সাধারণ বঙ্গ রঙ্গালয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাব মধ্যে ষ্টাব বঙ্গমঞ্চের নামই
 সমাধিক উজ্জ্বল। অধিকাংশ সুশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই নাট্য
 সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা এখন পুৰাতন চাল বজায় রাখিয়া আপনাদেব কৃতিত্বেব
 পরিচয় দিতেছেন। বাহাডুঘরে বৃথা অর্থ নষ্ট না কবিয়া, ইহারা অন্তঃসৌন্দর্য্য
 রক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত। ইহার সুযোগ্য ম্যানেজার অমৃতলাল বসু
 মহোদয় এ বিষয়ে একজন সুদক্ষ লোক। কিছুদিন হইল, ইনি চক্ষুরোগে
 আক্রান্ত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন, এক্ষণে ভগবানের রূপায় তিনি
 রোগমুক্ত হইয়া পুনরায় কার্য্যভাব গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা
 কল্লুলিয়া টোলার ১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ বিবাহার, শ্রীরামনবমীর দিনে
 জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৬ কৈলাশচন্দ্র বসু। ইনিও একজন
 সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সেক্ষপিয়ার প্রণীত গ্রন্থ সমূহে ইহার
 যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি একুপ সুন্দরভাবে সেক্ষপিয়ার পাঠ করিতে
 পারিতেন যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হইত। পিতার যাবতীয় গুণ পুত্রের
 ন্যস্ত হইয়া থাকে। তাই পিতৃগণামুগ্ধ পুত্রের হৃদয় পিতার ন্যায় কাব্যরসে

পরিপ্লুত হইল। অদ্বুত বীশক্তি সম্পন্ন অমৃতলাল শৈশব হইতেই কাব্যের প্রতি অনুরাগী হইলেন। সেই অনুরাগের অমৃতপ্রসবিনী স্রুফলে অমৃতলাল আজ বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম নেতা। বঙ্গসাহিত্যে অমৃতলালের স্থান অনেক উচ্চে। বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, তাজ্জব ব্যাপার, ব্রজলীলা, বিজয়-কলস, অমৃত মদিরা প্রভৃতি নাটক, প্রহসন, ও কাব্য তাহার প্রমাণ হইল। একদিকে স্বাভাবিক কাব্যরস রসিকতা, অন্য দিকে মর্শ্মভেদী তীব্র কটাক্ষ অমৃতের লেখনীর একটা অমৃতময় গুণ। সমাজের সজীব চিত্র অঙ্কিত করিতে অমৃত বাবু সিদ্ধহস্ত। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া একরূপ বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্তি প্রদান করুন। আমরা এবার আলোচনার সহিত তাঁহার একখানি সুন্দর প্রতিরূতি প্রদান করিলাম।

শোক সংবাদ।—মহাপূজার কাহারও দিন হাসিয়া কাটিয়াছে, কেহ বা সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধন প্রিয়তম আত্মীয়কে হারাইয়া গৃহকক্ষে বসিয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিয়াছেন। পূজার উৎসবের মধ্যেও আমরা একটি শোচনীয় ঘটনার কথা একদিনের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। কলিকাতা কুমারটুলির সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ নিশিকান্ত সেন মহাশয় পূজার এক সপ্তাহ পূর্বে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কেবল সুগণ্ডিত ও স্রুচিকিৎসক ছিলেন না, দয়া ও সদাশয়তা গুণেও তিনি তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; কত হৃৎখীদরিদ্রকে যে তিনি অকাতরে অর্থ ও ঔষধ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কবিরাজ নিশিকান্তের মৃত্যুতে বহু পরিবারে শোকধ্বনি উঠিত হইয়াছে। বিধির বিধানের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই, এখন আমাদের একমাত্র সাস্তনার কথা এই যে, কবিরাজ নিশিকান্ত সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন মহাশয় পিতার স্থান অধিকার করিবার যোগ্য হইয়াছেন। ইনিও পিতার ন্যায় সহৃদয় এবং গরীব হৃৎখীর বন্ধু। কবিরাজী শাস্ত্রেও ইনি বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীভূষণ বাবু পূর্বে হইতেই তাঁহার পিতার সহযোগিতায় নিযুক্ত ছিলেন, এখন তিনি শিষ্টামহ কবিরাজশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সহরের ও মফস্বলের রোগীদিগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কবিরাজ নিশিকান্ত সেন মহাশয়ের যে সকল পেটেন্ট ঔষধ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই সকল ঔষধ এখনও

পূর্বের ন্যায় অকৃত্রিমভাবেই প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে ; পূর্বের ন্যায় পঞ্জিকাও মুদ্রিত হইতেছে । সুতরাং সাধারণে কবিরাজ নিশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয়ের অভাব বোধিতে পারিবে না, এক্রপ আমরা আশা করিতে পারি । ভগবান্ শ্রীযুক্ত কালীভূষণ বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন ।

পোষ্টাল নটিশ ।—আমরা ভারতবর্ষীয় ডাকঘর সমূহের বড় কর্তার নিকট হইতে নিম্নলিখিত নোটাস প্রকাশ করিবার অনুমতি পাইয়াছি ।

১। ডাকঘরের মারফতে গভর্ণমেন্ট কাগজ ক্রয় করিবার বর্তমান নিয়ম-মুসারে যে কোন ব্যক্তি তিনি সেভিং ব্যাঙ্কের ডিপজিটর হউন বা নাই হউন, এক বৎসরের মধ্যে ১০০ শত টাকা কিম্বা তাহার কোনও গুণিতক অথচ ১০০০ হাজার টাকার অনধিক এক্রপ মূল্যের গভর্ণমেন্ট কাগজ ক্রয় করিতে পারেন এবং ডাকঘর মারফতে উক্ত সংখ্যা ৩০০০ হাজার টাকা লিখিত মূল্যের কাগজ ক্রয় করিতে পারেন ।

২। ১৯০৪ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ঐ সকল নিয়ম অনেকাংশে শিথিল করিয়া উহার স্থানে নিম্নলিখিত এমন কতক গুলিন নূতন নিয়ম সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, যাহাতে ঐ কাগজ ক্রয় করিতে সাধারণে বিশেষ সুবিধা বোধ করিবেন এবং আগ্রহান্বিতও হইবেন ।

(ক) ১০ টাকার কম না হয় এক্রপ পুরা টাকা ডাকঘরের মারফতে গভর্ণমেন্ট কাগজ ক্রয় করিবার জন্ত দাখিল করা যাইতে পারিবে । কিন্তু ইহার উক্ত সংখ্যা লিখিত নিয়মের অধীন ।

(খ) ডাকঘরের মারফতে ঐ কাগজ, ক্রয়, বিক্রয়, গভর্ণমেন্টের নিকট জিম্মা রাখা বা ক্রেতাকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য ফি, কমিসন, দালালী বা কোনও প্রকার খরচাই লাগিবে না ।

(গ) কন্টেইনার জেনারেল বাহাহুরের জিম্মায় ঐ কাগজ যতদিন থাকিবে, ততদিন উহার সুদের উপর ইনকম্ টেক্স লওয়া হইবে না ।

(ঘ) ডাকঘরের মারফতে ঐ কাগজ ক্রয় করিবার টাকার উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে । এক্ষণে সাবালকের পক্ষে ৫০০০ হাজার টাকা এবং নাবালকের পক্ষে ৪০০০ হাজার টাকা দাখিল করা যাইতে পারিবে ।

৩। নূতন নিয়মের বিশেষ বিধি ডাকঘরে দরখাস্ত করিলে জানিতে পারা যাইবে ।

বিজয়া ।

আজ বিজয়া উৎসব, এস পাঠক, আমরা ভ্রাতৃত্বাবে সংমিলিত হইয়া, পরস্পরে প্রেমালিঙ্গনে পরিতৃপ্ত হই। পরস্পর দ্বেষ হিংসা, মনোমালিন্য, বিবাদ বিসম্বাদ মায়ের প্রতিমূর্তি বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুতির অতল সলিলে বিসর্জন করি। এক বৎসর পর মা আসিয়াছিলেন, তিন দিন থাকিয়াই চলিয়া গেলেন, তাই কি এই আনন্দ উৎসব! মা গেলে কার আনন্দ হয়? তবে এ কোলাকুলি, গিলামিলি, আলিঙ্গন অভিবাদন কেন?

পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, সূর্য্যকুলোদ্ভব রঘুবংশাবতংশ রামচন্দ্র সীতাপহারী লঙ্কেশ্বর দশাননকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মুগ্ধায়ী ভগবতী কত্যাঘনীর অর্চনা করিয়াছিলেন, রাজা রামচন্দ্র ভগবতী কর্তৃক প্রাপ্ত বর হইলে মুগ্ধায়ী ভগবতী মূর্তি অতল সাগর-সলিলে বিসর্জন করেন, রামচন্দ্র প্রাপ্ত বর হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার বানর সৈন্যগণ আনন্দে আত্মহারা ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; সম্ভবতঃ তৎসাময়িক ঘটনাবলধনে বিজয়ার দিন এই কোলাকুলি প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। রামচন্দ্র শত্রুবিনাশে প্রাপ্ত বর হইয়া, বা শত্রু বিনাশ করিয়া পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন করিয়াছিলেন। পাঠক, তুমি ত মায়ের অর্চনা করিলে, শত্রু বিনাশ নিমিত্ত বরও প্রার্থনা করিলে, বহিঃ শত্রুর কথা দূরে থাক, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য এই যে ছয়টি অন্তঃ শত্রু রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কোন একটীর বিনাশের জন্য মায়ের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়াছ? তাই মায়ের মুগ্ধায়ী মূর্তি বিসর্জন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গৃহে আসিয়া প্রেমালিঙ্গনে উন্মত্ত হইয়াছ? বলিতে পার ভাই, অণিমাণ্ডি অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে কোন সিদ্ধি লাভ করিয়া সিদ্ধি পানে এত বিভোর হইয়াছ!

অনেকে বলিতে পারেন, মা আনন্দময়ীর প্রতিমূর্তি জলে নিমজ্জিত করিয়া মা হারা সন্তানগণের বিষাদের পরিবর্তে এত আনন্দোৎসব কেন? এ স্থলে “বিক্ষোর্মনসা পুতে স্থঃ” এই শাস্ত্রোক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, মন শব্দে জলই উক্ত হইয়াছে, আমরা বাহ্যদৃশ্যে প্রতিমাকে জলে বিসর্জন করিতেছি বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; প্রকৃতগত্রে আমরা মাকে জলরূপ মানস-সরোবরে লুকাইয়া রাখিতেছি, তবে ইহা বিসর্জন কি সংস্থাপন! তাই বিজয়ার বিষাদের পরিবর্তে বিপুল উৎসব! মাকে মনঃসলিলে রাখিলাম

বলিয়া আমরা অন্তরে নিশ্চল স্থখ, বিমল শান্তি অনুভব করি, সেই শান্তিতেই সিদ্ধিলাভ হয়, সিদ্ধিলাভ হইলেই সব সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তখন উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান বিরহিত হইয়া, পিতাপুত্রে, প্রভৃভৃত্যে, শত্রুমিত্রে পরস্পর মেহ ও প্রেমালিঙ্গনে পরিতৃপ্ত হই ।

পাঠক ! বিজয়ার দিন যখন আমরা দ্বানাস্তে গলবস্ত্র চইয়া—

“ও উত্তরে শিখরে দেবি ভূগ্যাং পর্কতবাসিনি

ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্জাতা গচ্ছ দেবি মমাস্তবং

ও গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরী

সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকি, তখন আমাদের নয়নকোণে যে অশ্রুবিন্দু দেখা দেয়, সে বিষাদ-অশ্রু, আনন্দ-অশ্রু, কি প্রেম-অশ্রু ? বলিতে পার পাঠক ! এ কোন্ অশ্রু ! আমরা বলি, এ অশ্রু ভক্তের আনন্দ ও প্রেম-অশ্রু ! তোমার আমার বিষাদ-অশ্রু ? বিষাদ-অশ্রু কেন জান, মাও চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সবই গেল ; তেমন চর্যা, চুয়া, লেহ, পেয় রসনা-তৃপ্তিকর ভোজনটা গেল ; সেরি, স্নান, স্নান, পাঁওকটী বিস্কুটের আমোদ প্রমোদটা গেল ; নরমনমোহকর বাইওয়ালীর বক্সিম নয়নের বিলোল কটাক্ষ এবং তাহাদের কষুর্কণিনিঃসৃত শ্রবণ-মধুর মধুর সঙ্গীত, হায় রে আজ সব গেল ! স্মরণঃ বলিতে হয়, এই বিসর্জন কার পক্ষে বিষাদ উৎসব, কার পক্ষে আনন্দোৎসব ।

এই বিজয়ার আলিঙ্গন (কোলাকুলি) অভিধান সঙ্ক্ষে আধ্যাত্মিক ভাব যাহাই থাকুক, যিনি যে ভাবেই ভাবুন না কেন, ইহা হইতে আমরা যে মহোপকার প্রাপ্ত হই, তাহার নাম সংমিলন । সংসারাসক্ত মানবগণ সর্কদাই স্বার্থ-বিজড়িত, সেই স্বার্থ সংরক্ষণ বা সংসাধন নিমিত্ত অনেক সময় পরস্পরকে পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদে সংলিপ্ত হইতে হয়, তখন পরস্পরের সহানুভূতি, ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি হৃদয়ের সুবৃত্তিচয় বিলয় হয় । হয়ত রায় মহাশয়ের সহিত দত্ত মহাশয়ের, মুখুয্যে মহাশয়ের সহিত চট্টোপাধ্যায়ের সামান্য কারণে অথবা বিনা-কারণে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত নাই ; এই বিজয়ার উৎসবের দিন লোকলজ্জা বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে উভয়েই যেন প্রেমালিঙ্গনে পরিতৃপ্ত হইলেন, এই মধুর দিনে এই মধুর সংমিলন কেমন মধুর, তাহা বঙ্গবাদী মাত্রেই অবগত

আছেন। বিজয়া উৎসব যে পরস্পরের মধ্যে প্রেম প্রীতি স্থাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাতে সন্দেহ কি? এস পাঠক! আমরা সদানন্দময়ী আনন্দময়ীর বিজয়া উৎসবে দ্বৈষ হিংসা বিস্মৃত হইয়া, সদানন্দে প্রেমালিঙ্গনে পরিতৃপ্ত হই।

এস ভক্ত ভ্রাতৃগণ। জগজ্জননী তারিণীর চরণ-সরোজে কিছু নিবেদন করিয়া এ বৎসরের মত বিদায় হই। মা, তুমি না কি জগজ্জননী! জগতের সকলেই তোমার সন্তান সন্ততি। সন্তানদিগের মধ্যে মাতৃস্নেহের কি কিছু তারতম্য আছে? যদি না থাকে মা, তবে তোমার সন্তানগণ মধ্যে কেহ পূজ্য, কেহ পূজক; কেহ সেব্য, কেহ সেবক; কেহ হুঃখী, কেহ সুখী; কেহ রোগী, কেহ ভোগী; কেহ তাপী, কেহ পাপী; কেহ জিত, কেহ বিজিত; শুনি মা, তোমার এক নাম অন্নপূর্ণা অন্নদা। তবে তোমার সন্তানগণ মধ্যে কেহ শীর্ণ, কেহ জীর্ণ; কেহ ক্ষুধাতুর, কেহ ভোগাতুর; কেহ দুর্বল, কেহ শবল; কেহ দণ্ডধারী, কেহ দণ্ডীধারী; কার পঞ্চামৃত, কার মুখামৃত; কার উপবাস, কার মৎস মাস; কার সর্বনাশ, কার পোষ মাস; কার হা অন্ন, কার পরমান্ন; বল মা অন্নদে! সন্তানের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? শুনি মা, কেহ কেহ তোমাকে দানবদলনী অসুরনাশিনী ব'লে থাকে; তবে কেন মা, তোমার হতভাগ্য সন্তানগণ দারিদ্র্যাসুরের দারুণ উৎপীড়নে সততই উৎপীড়িত, উৎকণ্ঠিত, ছুৰ্ভিক্ষ রাক্ষসীর দারুণ দংশিত্রা পেশনে নিষ্পেষিত, জর্জরিত! জরাসুর প্রেগাসুরের বিভীষিকাপূর্ণ কঠোর কটাক্ষপাতে সততই সজ্ঞাসিত। কৈ মা, যেমন এলে, তেমনি গেলে, তিন দিনের বেশী চারি দিন থাকলে না; গেলে মা গেলে, হতভাগ্য সন্তানগণের প্রতি ফিরেও চাইলে না! পাষাণের মেয়ে, তাই বুঝি পাষাণে বুক বাধিয়া চলে গেলে! যাও মা যাও, অন্নদে শিবদে সূর্যদে, পূর্ণদে, সারদে, বরদে, জয়দে, বিপদে শ্রীপদে আশ্রয় দিও মা! তোমার সন্তানগণ এক বৎসরের জন্ত কাতর নয়নে তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিবে এবং কাতরকণ্ঠে মা মা বলিয়া অশ্রুজলে বক্ষ প্রাবিত করিবে।

শ্রীসুরেশ্বর মুখোপাধ্যায় ।

দোষী কি নির্দোষী ।

Sanfordএর মোকদ্দমার সপ্তাহ খানেক পর আমি হত্যা সংযুক্ত একটা চুরির তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। Westmorelandএর Kendal সহরের নিকটস্থ মিঃ Bagshawe নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। স্থানীয় শাস্তিরক্ষক লণ্ডনপুলিসে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্যাগ্‌স তাঁহার পরিবারবর্গ সমেত কিছুদিন হইতে কেন্‌ডেল নগরে অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বাড়ীর ও সম্পত্তির রক্ষক সারাকিং নামক এক স্ত্রীলোককে পত্র লিখেন যে, তিনি শীঘ্রই তথায় যাইতেছেন। তিনি সেই সঙ্গে আরও লিখেন যে, তাঁহার ভাগিনা মিঃ রবার্ট বৃষ্টোও বিদেশ হইতে অল্পদিন হইল প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই লণ্ডন ত্যাগ করিয়া Five Oaks House (ব্যাগ্‌সের কেন্‌ডেলের বাড়ীর নাম) যাত্রা করিবেন, বাড়ী ঘর, পরিষ্কার এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিও। তাঁহার ভাগিনার পৌছাইবার সঠিক দিনের কথা কিং অনেক দোকানদারের নিকট হত্যা এবং চুরির পূর্বদিন বলিয়াছিল এবং মংশ, মাংস, মাখন প্রভৃতি বৃষ্টোর আহারের নিমিত্ত Five Oaksএ পাঠাইয়া ছিল। যে বালক মংশ লইয়া গিয়াছিল, সে বলিয়াছে যে, সে ঘরের অন্ধ উদ্যোতক দ্বার দিয়া দেখিয়াছে যে, একটা অপরিচিত যুবা ভদ্রলোক নীচ তলার বৈঠকখানা ঘরে বসিয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে জানা যায় যে, Five oaksএর দরজা বাহির হইতে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, ইহা ভাঙ্গা দ্বারের অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা হইয়াছে এবং ঐ দাসী স্ত্রীলোকটিকে কে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়াছে। প্রতিবেশীগণ তাহাকে প্রধান সিঁড়ির নিকট মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখে। তাহার পরণে কেবল রাত্রির গাউন ও পায়ে এক জোড়া মোজা এবং দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির মধ্যে একটা সামাদান ছিল। বোধ হয় সে নীচে কোন প্রকার শব্দ শুনিয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে নামিয়া আসিতেছিল এবং সিঁড়ির নীচে নামিবামাত্র দস্যুগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। মিঃ ব্যাগ্‌স পর দিবস আইসেন এবং তাঁহারই টাকা কড়ি সোণা রূপায় ৩৪ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে জানিতে পারেন। তাঁহার ভগিনী তাঁহার সঙ্গেই থাকিত, সে ভিন্ন কেবল বৃষ্টো জানিত

যে Five Oak এ টাকা আছে, কারণ কিরদ্বিস পূর্বে ব্যাগ্‌স তাহাকে পত্র লিখেন যে, রাইল্যাণ্ডের সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য টাকা অনেক দিন হইতে Five Oak এ পড়িয়া আছে; সাক্ষাৎ হইলে এ বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ করিব। ইহার পর বৃষ্টোকে আর কোথাও দেখা যায় নাই বা তাহার কথা শুনা যায় নাই। ইহাতেই তাহাকে লোকে দম্ভ্য এবং হত্যা-কারী বলিয়া সন্দেহ হয়। ব্যাগ্‌স যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার কতকাংশ ঘরের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহাকে যখন কেন্‌ডেলের আশে পাশে দেখা যাইতেছে না বা তাহার কথা কেহ বলিতে পারিতেছে না, তখন নিশ্চয়ই সে অপহৃত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া লণ্ডনে গিয়াছে, এবং তাহার আকৃতি এবং পোষাকের বিবরণ সেই মৎস্তবাহক বাণকের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছে। তাহার জোসিয়া বার-নেস নামক ব্যক্তিকে আমাদের অনুসন্ধানের সাহায্যকল্পে পাঠাইয়াছেন। বারনেস অতিশয় চতুর এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। হতভাগিনী সারা-কিংএর সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল বলিয়া সে ধৃত হইয়াছিল। তাহার পূর্বে একত্রই অবস্থান করিত; কিন্তু তাহার অনন্তম্ভাব ও অন্যায় বদ অভ্যাসের জন্য কিং তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। সে অল্প সময়ই আমাদের নজরের উপর ছিল, ইহার মধ্যেই সে প্রকাশ করে যে, কিংকে সে প্রকৃতই ভালবাসিত এবং তাহার হত্যাকারীকে ধৃত করিতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে। বারনেস উৎসব উপলক্ষে লোকের বাড়ী বেহালা বাজাইত। সরাইয়ে বসিয়া গান গাহিত, নাচিত এবং নানারূপ জন্মের অনুকরণে শব্দ করিত। এই সকল বিষয়ে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, এবং তাহার পৈতৃক সূত্রধরের ব্যবসাতেও সে বিলক্ষণ উপায় করিত। তাহাকে আমাদের সঙ্গে রাখিবার প্রধান কারণ, সে বৃষ্টোকে চিনিত। আমি কর্তৃপক্ষের নিকট আজ্ঞা এবং উপদেশ চাহিলামাত্র তাহাকে সঙ্গে করিয়া কন্টে গার্ডেনে হাম্‌ মাম্‌স্‌ হোটেলের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। হোটেলের বাইরা জানিলাম যে, বৃষ্টো এক সপ্তাহ পূর্বে তাহার দেনা পাওনা শোধ না করিয়াই কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সেই হইতে তাহার তাহার কোন সংবাদ জানে না এবং বৃষ্টোও তাহার জিনিষ পত্র লইতে হোটেলের আর আইসে নাই।

“সে এখন চলিয়া যায়, তখন তাহার পোষাক কি রকম ছিল?”

‘সচরাচর যাঁহা পরিধান করিত তাহাই :—সোনার বকনীয়ুত একটা পালকের টুপি, একটা কালরঙের কোট, একটা আঁটা ট্রাউজার এবং একজোড়া নয়ম চামড়ার বুট।’

মৎস্য-বাহক বালকও ত এই রকম পোষাকের কথাই বলিয়াছে ! আমরা তৎপর অপহৃত কোন নোট ভাঙ্গাইবার জন্ত উপস্থিত করা হইয়াছে কি না, জানিবার জন্ত ইংল্যান্ড ব্যাংকে উপস্থিত হইলাম। মিঃ ব্যাংস আমাকে অপহৃত দ্রব্যের যে তালিকা দিয়াছিলেন, আমি তাহা ব্যাংকের কর্মচারীর হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন যে, কল্যা প্রান্তঃ-কালে একটা ভদ্রলোক—এক বিচিত্র পোষাক পরিধান করিয়া মাথায় একটা পালকের টুপি দিয়া আসিয়া, এই সকল মথরের নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়া গিয়াছে। নোটের পশ্চাতে লেফটেনেন্ট জেমস্ বলিয়া নাম লিখা আছে, বাড়ীর ঠিকানা দিয়াছে, হারলে ষ্ট্রীট, ক্যাভেন্ডিশ্ রোয়ার। অবশ্য এ নাম ও ঠিকানা কাল্পনিক ! আমি তৎপর Scotland yardএ আসিয়া রিপোর্ট দিলাম যে, কোন সন্ধান করিতে পারি নাই। রিপোর্ট পাঠাইয়া আমি ভাবিতেছি যে, একটা বিজ্ঞাপন দিই যে, যে কেহ বৃষ্টোকে ধরিয়া দিতে বা তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করা যাইবে। এইরূপ কল্পনা করিয়া আমি বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় দেখি যে, ঠিক পূর্ব বর্ণিত পোষাক পরিয়া রবার্ট বৃষ্টো পোষ্ট অফিসের নিকট দিয়া যাইতেছে ! আমি সঙ্গীকে কোন রকমের সন্দেহ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে নির্ঝিগ্নে যাইতে দিতে উপদেশ দিলাম এবং বারনেস্ আসিলে অলক্ষিতে তাহার পশ্চাতে যাইয়া তাহার নিকট সপ্তাহ পূর্বে একটা ডাকাইতির কথা অসংলগ্ন ভাবে বলিতে বলিয়া দিলাম। শেষোক্ত ব্যক্তি বিশেষ কোন কথা জানিতে পারিল না, এবং আমার সহকারী তাহার বর্ণনা শ্রবণ করিয়া ‘ব্যাপারটাকে ভারি একটা প্রেহেলিকা বলিয়া মনে করিলেন, এবং তাহাকে বলিল যে, পুলিশ এ বিষয় অমুসন্ধান করিবে। বৃষ্টো যেমন তথা হইতে Strand পথ দিয়া Scotland yardএ যাইবার জন্ত মোড় ঘুরিল, আমিও সেই সময় তথায় উপস্থিত হইলাম। সে নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু Saracen’s Headএ যাইয়া সে আমার আশ্চর্য্য উদ্বোধিত করিয়া রাজির পাড়ীতেই যাইবার জন্য কেন্‌ডেলের টিকিট ‘করিল। তৎপর সে সরাইয়ের

ভিতর যাইয়া চা খাওয়া ঘরে বসিয়া এক পাইন্ট সেরি ৩ বিকুট আনিতে বলিল। তাহাকে আপাততঃ নিরাপদ দেখিয়া, কোন্ উগ্রায় অবলম্বন করায় শ্রেয়ঃ তাহা ভাবিতে ভাবিতে আমি প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখি, খুব জাঁকের পোষাক পরিয়া তিনজন যুগ্মকৃতির লোক,— তন্মধ্যে একজনকে তাহার বিচিত্র পরিচ্ছদ সত্ত্বেও আমি চিনিয়াছিলাম,— বুকিং অফিসে প্রবেশ করিল। তাহারা কি করে জানিবার জন্য আমি গোপনে নিঃশব্দে আসিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। আমার পরিচিত লোকটী কেরানীকে জিজ্ঞাসা করিল,—রাত্রির ডাকগাড়ীতে কেনডেলে যাইবার আর স্থান আছে কি? কেনডেলে! আজ সকলেই সেখানে যাইতেছে কেন? সেখানে কি কোন উৎসব হইয়াছে, না লোকের অভাব হইয়াছে? আমার পরিচিত লোকটী তিনজনের ভাড়া টেবিলের উপর রাখিয়া শেষে যাহা বলিল, তাহাতে আমি প্রকৃতই বিস্মিত হইলাম। সে বলিল,—“এই মাত্র মাথায় “পালকের টুপি” দিয়া যে ভদ্রলোকটী প্রবেশ করিলেন, তিনিও কি আমাদের সহযাত্রী!”

“হাঁ, তিনিও টিকিট লইয়াছেন। আমার বোধ হয় তিনি এখন জিজ্ঞাসে আছেন!”

“ধন্যবাদ মহাশয়।”

আমি দরজার পাশ হইতে প্রস্থান না করিতেই তাহারা তিনজন স্বয়ং হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠানে যাইয়া পারচাঙ্গি করিতে লাগিল। “পালকের টুপি” কথাটি শুনিয়াই কেন্ডেলের ব্যাপারে তাহারা লিপ্ত আছে এই সন্দেহ আমার মনে উদয় হইল। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে, আমি এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহারা অতঃপর কি খেলা খেলে তাহা জানিবার জন্য আমিও তাহাদের পশ্চাদাহরণ করিতে মনস্থ করিলাম। পরে আমি টিকিট ঘরে যাইয়া আনিলাম যে, এখনো দুইটা স্থান খালি আছে, আমি সে দুটি জেম্‌স্ জেন্‌কিন্স এবং জোসিয়া বার্নেসের জন্য স্থির করিলাম।

তাহার পর আমি চা খাইবার ঘরে বসিয়া দেখি, বুটো তখনো গভীর এবং উদ্বেগপূর্ণ চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া আছে। তখন আমি একখানি পত্র লিখিয়া সুরাইয়ের চাকর দ্বারা পাঠাইয়া দিলাম। এখন আমার দৃষ্টি ও হস্তাকারীকে লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট সময় হইল। আমি তাহার মুখের

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, তাহার মুখ বিবর্ণ, কিন্তু তাহাকে চালাক বলিয়া বোধ হইল। বয়স অল্পমান ২৬ বৎসর,—মধ্যমাকৃতি, গঠন সৌন্দর্য, প্রশংসনীয় এবং যদিও সে নিরন্তর পরিলক্ষণে ক্লান্ত, তবুও তাহাকে দেখিয়া তত্কালেক বলিয়াই বোধ হয়। তাহার চেহারা চিত্তাকর্ষিত, কিন্তু পুরাতন অপরাধীদিগকে হঠাৎ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে যেমন তাহাদের মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়, আমি সেরূপ কোন ভাব তাহার মুখমণ্ডলে দেখিতে পাইলাম না। সেখানে অনেক লোক বাওয়া আসা করিতেছিল; আমি তাহাকে একবার পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলাম। আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, যে ব্যক্তি সবে মাত্র হত্যা করিয়াছে এবং দস্তাভালক স্বর্ণমুদ্রা এবং নোট ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছে, সে কখনো থতমত না খাইয়া কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না। বিচারালয়ের নিমিত্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, তবে সে দোষী কি না, ইহাই আমার জানিবার উদ্দেশ্য। তাহাকে আমার নির্দোষী বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল, কারণ দোষীর চেহারা এরূপ সন্দেহশূন্য হইতে পারে না। আমার কর্তব্য, দোষীকে শাস্তি দেওয়া ও নির্দোষীকে মুক্ত করা, সেই জন্যই আমি ভাবিলাম যে, যদি আমি বুঝিতে পারি, সে নির্দোষী, তাহা হইলে তাহাকে এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিব। এইরূপ স্থির করিয়া আমি গৃহ হইতে নিজ্জান্ত হইলাম, এবং কিয়ৎক্ষণ পর ক্ষুণ্ণগণে গৃহে পুনরায় প্রবেশ করিয়া সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখের বাকের উপর উঠিয়া তাহার হস্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া অতি কর্কশকণ্ঠে বলিলাম, “এতদিনে তোমাকে ধরিতে পারিলাম।” তাহার চেহারার কোন পরিবর্তন নাই। কোন উত্তেজনা নাই, কোনরূপ ভয় নাই, সে অতি রুস্তবরে আশ্চর্য্যভাবে বলিল,—“এ নির্দোষ কি বলে?”

“কমা করিবেন মহাশয়।” আমি বলিলাম, “আমার একজন বন্ধু বলিলেন যে, ব্যাগ্‌স নামক এক ব্যক্তি এখানে বসিয়া আছে। আমি তাহাকে মনে করিয়া আপনাকে ধরিয়াছি।”

তিনি অতি নম্রতার সহিত আমার ত্রুটি মার্জনা করিলেন এবং ধীর-ভাবে বলিলেন যে, যদিও তাহার নাম বুটো, তবুও জেমস নামে তাহার এক নামা আছে। তাহার কথা শুনিয়া আমার ঐক্য ধারণা হইল যে, সে নির্দোষী, কিন্তু তবুও—। এই সময় সন্ধ্যারক্ষক আলিয়া আমার বিরক্ত করিল ;

তাঁহাকে আমি যে ভদ্রলোকের নিকট পত্র দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম, তিনি আসিয়াছেন। আমি বাহিরে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, বুট্টোকে তিনি যেন চোখে চোখে রাখেন। অন্তঃপর আমি রওনা হইবার বন্দোবস্ত করিতে তাড়াতাড়ি বাসার গেলাম।

রেশমী জামা, জড়ীয়ার টুপি, সবুজ চন্দা, এবং বহুমুদার ওয়েস্টেকোট এবং শালের সাহায্যে আমি নিজেকে একটা সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিতে পরিণত করিয়া জোসিয়া বারনেনস্কে সঙ্গে লইয়া রওনা হইলাম। বুট্টো প্রকৃতির সঙ্গে যে ভাবে কথা কহিতে হইবে, আমি ইতিপূর্বেই তাহাকে শিখাইয়া ছিলাম। আমরা সরাইয়ে যাইয়া দেখিলাম, মিঃ বুট্টো সেই ভাবেই বসিয়া আছে। কিন্তু অন্য লোক তিনটা বিশ্রিতভাবে চতুর্দিকে তাকাইতেছে। আমার ধারণা হইল যে, কে কে তাহাদের সঙ্গে যাইবে, তাহা জানিতে তাহারা বিশেষ ব্যগ্র। ইতিমধ্যে আমার এবং বারনেনসের উপস্থিতি তাহাদিগের উৎস্রুত ও ব্যগ্রতা আরও বর্দ্ধিত করিল। এবং বারনেনস যদিও নির্দোষ নয়—তবুও সে এইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল যে, দেখিলে বোধ হয়, সে যেন নিতান্ত বর্বর। কিয়ৎক্ষণ পর গার্ড গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেত করিল এবং আমরা যাত্রা করিলাম।

যাহাদিগের সঙ্গে আমি রওনা হইলাম, তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক অসামাজিক ব্যক্তি আমি আর কখনো দেখি নাই। সকলেই নির্দোষ। প্রত্যেকেই শারীরিক কি মানসিক কোন লক্ষণই প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। পথে কেবল ২১টা ঘটনা হইয়াছিল, বাহা প্রয়োজনীয় না হইলেও আমি নোটবুকে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। গাড়ী যখন কেন্ডেলের ২৩টা স্টেশন পূর্বে, তখন আমি অস্থচলকের সহিত পূর্বোক্ত তিনজন লোকের মধ্যে একজনের কথা শুনিলাম। তাহার কথার সার মর্ম্ম এই যে, নির্দিষ্ট স্থান হইতে ছয় মাইল পশ্চাতে এক সরাইয়ে তাহারা নামিবে।

তাহাদের কথা শুনিয়াই আমি আমার সঙ্গীকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, “উহারা যেখানে নামিয়া থাকিতে চাহিতেছে, তুমি কি সে স্থান চিন ?”

“ভাল রকম চিনি, Five Oaks House হইতে উহা দুই মাইলের মধ্যে।”

“সত্য, তবে তুমিও যেখানে নামিয়া তাহাদের কার্য কলাপ দেখ, আমি বুট্টোর সহিত কেন্ডলে বাই।”

“বৃদ্ধনে।”

“তুমি কেন্‌ডেলের টিকিট লইয়া কি বলিয়া সেখানে নামিবে? এ প্রকারের লোক প্রায়ই সন্দেহ হয়। কিন্তু আমাদের কার্যোদ্ধারের নিমিত্ত তোমাকে এই ভাবে থাকিতে হইবে যে, তাহারা যেন কিছুতেই তোমাকে সন্দেহ না করিতে পারে।”

“তাহা আমার উপর নির্ভর করুন। আমি তাহাদের মত শতাদিক অন্ধের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারি।”

“আচ্ছা, তা দেখিব। এখন আহাৰ করি।”

অরক্ষণ পরেই গাড়ী পুনরায় ছাড়িল। বাবনেস তাহার পকেট হইতে এক বোতল সুবা বাহির করিয়া পান করিতে লাগিল। সে এত অধিক পরিমাণে পান করিল যে, অচিরেই তাহাকে হতচেতন্য হইয়া পড়িতে হইল। তাহার চক্ষু, পদ, হস্ত প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গই যেন বিকল হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে সে ঝগড়া আরম্ভ করিল। তাহার কাণু দেখিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল যে, বোধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মতই অভদ্র ও নির্কোষ বলিয়া তাহাকে মনে না হয়, সে কিন্তু খুব সাবধান হইয়া চলিতে লাগিল। যখন গাড়ী থামিল, তখন সে আমার অলক্ষিতে কেমন করিয়া গাড়ী হইতে বাহির হইয়া টলিতে টলিতে ষ্টেসনের বিশ্রাম গৃহে যাইয়া বসিয়া পড়িল এবং উচ্চকণ্ঠে বলিল যে, কল্যা প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত সে তথা হইতে আর এক পাও মড়িবে না। অথ-চালক সুবা তাহাকে তৎসনা করিয়া তাহাকে মাতাল অবস্থাতেই তথায় রাখিয়া যাইতে মনস্থ করেন! আমি তাহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, বিশ্রাম কক্ষ হইতে সকলে বাহির হইয়া গেলে আমি তাহাকে তাহার নির্কুজিতার জন্ত বিলক্ষণ তিরস্কার করিতে লাগিলাম। আমার কথা শুনিয়া সে একবার চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর তাহার শরীর ও চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় করিয়া মূরল বাক্যে বলিল,—“আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, এ কার্য আমি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিব।” দ্বার উদ্বাটিত হইল এবং সে মূহুর্তের মধ্যে মাতালের ন্যায় হাব-ভাব করিয়া ফেলিল। সে প্রকৃতির নিকট এই সকল অভ্যাস শিক্ষা করিয়াছিল। আমি তাহার কথা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলাম এবং অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম।

চালক গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এখন গাড়ীর ভিতর বৃষ্টো ও আমি এই দুইটা মাত্র আরোহী দেখিয়া আমি আমার ছদ্মবেশ অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম। আমি চম্বা, চুপি, শাল প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলাম।

আমার বেশ পরিবর্তিত দেখিয়া বৃষ্টো উপহাস করিয়া বলিল, “এরূপ সং সাজিবার প্রয়োজন কি?”

আমি সংক্ষেপে ও ধীরভাবে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তিনি তাহার আমার বিপদের কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলেন। যদিও তিনি বিমূঢ় ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, তব্বাচ আমি তাহাকে দোষী বলিয়া ধারণা করিতে পারিলাম না।

আমি বলিলাম,—“বৃষ্টো, আমি তোমার গোপনীয় কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু যে বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম, বতর্কণ না সে বিষয়ে তুমি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পার, সে পর্য্যন্ত তোমার অবস্থা বিপদজনক জানিবে।”

তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—“সত্য কথা, ইহা অতি অবিদ্বৃত ফন্দি। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার নির্দোষীতা আপনিই প্রমাণিত হইবে।”

তৎপর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল এবং আমার পূর্ব উপদেশানুযায়ী চালক যে পর্য্যন্ত কেন্‌ডেলের কারাগারের কটকের সম্মুখে গাড়ী না থামাইল, সে পর্য্যন্ত আমরা কেহই কথা বলিলাম না। জেলের নিকট গাড়ী থামিতে দেখিয়া বৃষ্টো চমকিয়া উঠিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব লুপ্ত করিয়া বলিল,—“অবশ্য আপনি আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করুন। কিন্তু আমি সেই সর্বদ্রষ্টার সততার উপর কখনো অবিশ্বাস করিতে পারিব না।”

আমরা জেলে প্রবেশ করিলাম এবং বৃষ্টোর পরিচ্ছদ ও বাক্যাদি অতি গুচ্ছগুচ্ছরূপে অন্বেষণ করিলাম। আমি বড় হত্যার মধ্যও তাহার টাকার খলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের একটি স্প্যানিস্ স্বর্ণমুদ্রা ও তাহার বাক্সের ডালার মধ্যে অতি চতুরতার সহিত আড়াআড়িভাবে রক্ষিত মণি-সুকশ্ণচিত্র একটা বহুমূল্য দ্রব্য পাইলাম। আমি এই দুইটা জিনিষই চিহ্নিত করিলাম।^১ কারণ লণ্ডন পুলিশ *His Majesty's Oak's House* হইতে অপরূপ দ্রব্যের যে তালিকা দিয়াছিল; তাহার মধ্যে এই দুইটা জিনিষেরও উল্লেখ ছিল। আমাদে

অতি দৃঢ়তার সহিত বলিল যে, ঐ দুইটী জিনিষ তাহার বাক্সে কেমন করিয়া আসিল তাহা সে কিছুই জানে না। এইসময়ে আমি চিন্তা করিতেছিলাম যে, আমি বাহাকে নির্দোষী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহার নিকট হইতেই অপদ্রব্য দ্রব্য বাহির হইল। আমি তা এ পর্য্যন্ত দোষী ব্যক্তির চেহারা এরূপ সঙ্কোচশূন্য, উদ্বেগহীন হইতে দেখি নাই।

আসামীর কথা শুনিয়া জেলরক্ষক অবজ্ঞার সহিত বলিল,—“আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এ জিনিষ তোমার নিদ্রিতাবস্থায় তোমার বাক্সে আসিয়া রহিয়াছে।”

আমিও হাসিয়া বলিলাম,—“তাহার ঘুম-বোরে ? আমি তাহা পূর্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম না।” আসামী চমকিয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিবার পূর্বেই আমি জেল পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।

পরদিন তাহার বিচার দেখিবার জন্য আদালতগৃহ লোকারণ্য। সেদিন আরো দুই একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিলেন। আসামীর অবস্থা ও ঘটনার বৈচিত্র্য ও গূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য সহরের ও নিকটবর্তী স্থানসমূহের সকল লোকেই উৎসুক। আসামীর চেহারা উদ্বেগপূর্ণ হইলেও শান্ত এবং তাহার উজ্জল বড় বড় চক্ষু দুটীতে যেন ধৈর্য্য ও নম্রতা মাথান আছে, বাহা দোষী ব্যক্তিতে কখনো থাকিতে পারে না।

অজ্ঞান্য দুই একটা সাক্ষীর অবানবন্দী হইলে পর, সেই মন্তব্যবাহক বালককে উপস্থিত করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, যে চুরির পূর্বদিন সে Five Oaks Houseএ যাহাকে দেখিয়াছিল, তাহাকে দেখাইতে পারে কি ? বালকটী মিনিট থানেক নিঃশব্দে আসামীর দিকে চাহিয়া বলিল, “সে লোকটী তখন মাথার টুপি দিয়া আগুনের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। ইনি মাথার টুপি দিলে আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিব।” মিঃ ব্যাগস কর্তৃক আসামীর পক্ষে নিযুক্ত সলিসিটর মিঃ কাউডন ইহাতে আপত্তি করিলেন। বিচারপতি তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন। তৎপর সামান্য সাক্ষীরা বলিল যে, তাহার মৃত সারাকিংএর নিকট শুনিয়াছিল যে, তাহার মনিবের ভাগিনের নিশ্চয় Five Oaks হাউসে আসিবেন। মিঃ কাউডন ‘শোনা’ কথা প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না, বলিয়া আপত্তি করার তাহাও অগ্রাহ্য হইল। তৎপর আসামী বলিল,—“সারাকিং আমার মাকুলের পুরাতন ভৃত্য নহ, ভৃত্যঃ তাহাকে আমি যে চিনি না, এ কথা বলিলে অপদ্রব্য হয় না।”

বিচারকেরা বিবেচনা করিলেন যে, এই সব বিষয়ের মীমাংসা জুরি দ্বারা হওয়া উচিত, কিন্তু প্রথমতঃ দেখা কর্তব্য যে, আসামীকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার উপযুক্ত হেতু আছে কিনা? পরে একজন কনেটবলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। সে Five Oaks হাউসে একথান পত্রের কিয়দংশ পাইয়াছিল, তাহা আদালতে দেখাইল। তৎপর মিঃ ব্যাংসকে ডাকিবার আদেশ হইল। এই আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া আসামী বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল, এবং আদালতের নিকট প্রার্থনা করিল যে, বছবৎসর পর তাহার মাতুলের সঙ্গে আজ একবার প্রথম সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেওয়া হউক।

বিচারপতি তাহাকে অতি দয়াক্ষেপে বলিলেন,—“বৃহো, তোমার অসাক্ষাতে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করিব না, ও তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণও পাই নাই। তোমার মাতুলের সাক্ষ্য কিছু সময় লাগিবে, কিন্তু তাহা অনিবার্য। তৎপর তাঁহার সহিত আলাপ করিও।”

সত্তর বৎসর বয়স্ক পুরুষ এক বৃদ্ধ উপস্থিত হইলেন। বার্ককে ও শোকে তাঁহার দেহ নোয়াইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার চক্ষু মৃত্তিকাসংলগ্ন, এবং তাঁহার সমস্ত চেহারা যেন শোক ও হতাশে মিশ্রিত। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আসামী ‘মামা’ বলিয়া তাঁহার দিকে লাফাইয়া আসিল। বৃদ্ধ চক্ষু তুলিলেন, ভাগিনেয়ের মুখে তখন একটা সরলতা ও পবিত্রতার অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়া কম্পিতপদে বিস্তৃত হস্তে তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে জড়িতকণ্ঠে বলিলেন,—“রবার্ট! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, মুহূর্তের জন্তও তোমাকে সন্দেহ করি নাই। মেরিও করে নাই,—মুহূর্তের জন্যও করে নাই।”

তাঁহাদের হৃদয়ের এই অব্যক্ত উচ্ছ্বাসের সময় আদালত-গৃহ সম্পূর্ণ নীরব। কিয়ৎক্ষণ পরে আদালতের একজন কর্মচারী বৃদ্ধের হাত ধরিয়া আদালতের কথায় কর্ণপাত করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া আদালতের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—“নিশ্চয়ই আদালতের কথা শুনিব।” মহাশয়, আমার ভগিনীর পুত্র শৈশব হইতেই আমার নিকট আছে, আমার আশা আছে, আপনি তাঁহাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন।” বিচারপতি বলিলেন, “মিঃ ব্যাংস, ক্ষমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই অগভীর ঘটনার মূল জনিবার প্রয়োজন। এই পত্রখানি একজন সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছে। দেখুন ত, ইহা আপনাদের বেথা কি না, এবং আপনি আপনার

ভাগিনেয়কে কোন কার্যোপলক্ষে Five Oaks Houseএ যে প্রচুর অর্থ রাখিয়াছেন, এই কথা জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এ পত্র তোমারই কোন অংশ কি না ?”

“হাঁ।”

আদালতের কেরানী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“আপনি অপহৃত যে দ্রব্য পাইয়াছেন, তাহা উপস্থিত করুন।”

আমি সেই দ্রব্য দুইটি টেবিলের উপর রাখিলাম।

বিচারপতি বলিলেন,—“মিঃ ব্যাগস্, একবার এই তিনিস দ্বিটী দেখুন এবং শপথ করিয়া বলুন দেখি, আপনার অপহৃত দ্রব্যের মধ্যকার এই দুটি কি না ?”

বৃদ্ধ একটু ঝুলিয়া পড়িয়া ভাল করিয়া জিনিস দুটি দেখিলেন, তৎপর তাঁহার ভাগিনেয়ের দিকে একবার চঞ্চলদৃষ্টে তাকাইয়া নীরব হইয়া থাকিলেন।

আদালতের কেরানী বলিলেন,—“মিঃ ব্যাগস্, হাঁ কি না, একথা আপনার বলা প্রয়োজন।”

আসামী শাস্তভাবে বলিল,—“মামা! উত্তর করুন, আমার জন্য ভয় করিবেন না। আমি যদি নির্দোষী হই, তবে জেখরের কুপার আমি এই ফাঁদ শীঘ্রই উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব।”

“স্ববার্ট তোমাকে আশীর্বাদ করি। আমার বিশ্বাস আছে, তুমি তাহা করিতে পারিবে। হাঁ মহাশয়, দুইটি আমারই অপহৃত দ্রব্য।”

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আদালত গৃহের সকলেই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তৎপর আমার সাক্ষ্য দেওয়া হইলে পর বিচারপতি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আসামীকে বলিলেন,—“তোমাকে জুরির হস্তে সমর্পণ করিবার বিশেষ প্রমাণ আদালত পাইয়াছেন। তোমার জবাব আদালত শুনিতে বাধ্য, কিন্তু আমার ধারণা, তোমার আইন-পরামর্শদাতা তোমাকে কোন কথা কহিতে দিবেন না।

মিঃ কাউওন, বিচারপতির কথায় সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু আসামী দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতীবাদ করিয়া বলিল,—“আমি চূপ করিয়া কেন থাকিব ? আমি কিছুই গোপন করিব না। আমি এই ঘৃণিত মোকদ্দমার আইন-ব্যবসায়ীর কুটতর্কে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি যদি নির্দোষী না হই, তবে কখন মুক্তির আশা করি না। আদালতে আমার আত্ম-

সমর্থনার্থ এই কথাগুলি বলিবার আছে ;—যে দিন আমি আমার মাতুলের পত্র পাই, সে দিন সন্ধ্যার সময় আমি Dreary Lane এ থিয়েটার দেখিতে যাই, ফিরিতে কিছু বিলম্ব হয়। আমি হোটেল প্রত্যাবৃত্ত হইলে দেখি, আমার পকেটবুকখানা কে চুরি করিয়াছে। সেই নোটবুকে কেবল যে মাতুলের পত্র-খানা ছিল, তাহা নহে ; তাহাতে অনেক টাকার নোট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল। সে রাত্রিতে অহুসন্ধান করিবার সময় নাই বিবেচনা করিয়া, পরদিবস প্রাতঃকালে যখন আমি পোষাক পরিয়া পুলিশে সংবাদ দিতে যাইতে উদ্যত হই, তখন আমি সংবাদ পাই যে, একজন ভদ্রলোক কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি একজন ডিটেক্টিভ কর্মচারী। আমার টাকা প্রভৃতি চুরি যাইবার কথা কোন কারণে প্রকাশ হইয়াছে, সুতরাং এখনই তাহার সহিত আমাকে চুরির কিনারা করিবার জন্য যাইতে হইবে। সমস্ত দিন প্রত্যেক রাত্তায় এবং প্রত্যেক সন্দেশপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ করিয়া পুলিশ কর্মচারী বলিলেন যে, চোর ইংলণ্ডের পশ্চিমে নোট ভাঙাইতে গিয়াছে, আমাদেরও আর সময় নষ্ট না করিয়া তথায় যাওয়া উচিত। তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা হইবার জন্য জিহ্বা করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে, হোটেল যাইয়া রাত্রিতে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসি, কিন্তু তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন যে, আমি আপনাকে রাত্রের পোষাক দিতেছি পরিধান করুন ; আর এখন রওনা না হইলে, রাত্রির গাড়ী পাওয়া যাইবে না। যথাসময়ে আমরা বৃষ্টলে পৌঁছাইলাম এবং দিন কতক বৃথা অহুসন্ধান করিলাম। শেষে তিনি লওনে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিবার একঘণ্টা পরে আমি Scotland yard এ সমস্ত ব্যাপার জানাইলাম এবং পরে আমি রাত্রির গাড়ীতে কেন্‌ডেলে আসিবার টিকিট করিলাম। ইহাই আমার কথা।”

আসামীর কথা শ্রবণ করিয়া বিচারপতি কিম্বা দর্শকমণ্ডলী কাহারো বিশ্বাস হইল না কিন্তু আমি তত্রাৎ তাহার কথা সত্য বলিয়া মনে করিলাম। কারণ মন-গড়া গল্প একরূপ সরল হইতে পারে না। মিঃ ব্যাগস সাক্ষ্য দিয়াই আদালত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

আদালতের কেরানী বলিলেন,—“মিঃ বৃষ্টো, তোমার কথা প্রমাণ করিতে পারিবে ?

বৃষ্টো নম্রভাবে বলিল,—“আমি আশা করি।”

কার্ক একটু ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন,—“তাঁহা হইলে এ অপহৃত দ্রব্য তোমার বাস্কে কেমন করিয়া আসিল ?”

বৃষ্টো পূর্বভাবেই বলিল,—“কথাই শু তাই, আমি এ রহস্তের কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ।”

আর কিছু বলা হইল না, বিচারপতি আসামীকে ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যার অপবাধে অপরাধী বিবেচনা করিয়া Anetty জেলে পাঠাইবার আদেশ করিলেন । এইসময় বারনেসেব লিপিত একখানি পত্র আমাব হস্তগত হইল । আমি পত্রখানি এক পলক দেখিতে না দেখিতেই আগামী কল্য বিচারজ্ঞা মূলতুবি রাখিবাব জন্য প্রার্থনা করিলাম । কারণ আগামী কল্য আমি একজন প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দী দেওয়াইব এবং তাহার সাক্ষ্য এ মোকদ্দমাব বিশেষ প্রয়োজনীয় । আমার প্রার্থনা অবশেষে গ্রহণ হইল, আসামী হাজতে প্রেরিত হইল । তৎপর সে দিনের জন্য আদালত ভঙ্গ হইল ।

আমি মিঃ বৃষ্টোকে গাড়ীতে করিয়া হাজতে লইয়া যাইবার কালে ধীরে ধীরে বলিলাম,—“মহাশয়, মনে কিছু করিবেন না, আমরা এ রহস্য উদ্ঘাটন করিব । ভগবানের উপর নির্ভব করুন ।” বৃষ্টো কোন কথা না কহিয়া একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাব দিকে চাহিল এবং পরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া উদ্ভেজনার আতিশয্যে গাড়ীর মধ্যে লাকাইয়া উঠিল ।

আসামীকে যথা স্থানে রাখিয়া আমি আমাদের পরামর্শের গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বারনেসকে বলিলাম,—“ভাল, তুমি কি অনুসন্ধান করিলে ?”

“যে সরাইতে আমাকে রাখিয়া আসিয়াছিলে, সে সরাইতেই সারাকিংএর হত্যাকারীরা আছে ।”

“হাঁ, তা ত আমি তোমার পত্র পাঠে অবগত হইয়াছি, তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ পাইয়াছ ?”

“তুন, তাহারা আমাকে সম্ভান জ্ঞান করিয়া আমার সাক্ষাতেই গল্প করিতে লাগিল । তাহাদের গল্প শুনিয়া আমি বুঝিলাম যে, তাহারা ই অপরাধী এবং তথায় তাহারা অপহৃত দ্রব্য লইয়া যাইতে আসিয়াছে । সেই সকল দ্রব্য তাহারা নিকটবর্তী একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে । তাহারা অদ্য রাত্রেই দ্রব্য সকল লইয়া যাইবে ।”

“আর কিছু শুনিয়াছ ?”

“হাঁ, তাহাদের তিনজনের মধ্যে যে কনিষ্ঠ, সেই বদমাসেসটা যে বৃষ্টোর

পার্শ্বে বসিয়াছিল এবং আসিবার সময় গাড়ীর মধ্যে পরম বলিয়া কোচবাক্সে বসিয়াছিল,—”

“হী হী, মনে পড়িয়াছে, বলিয়া যাও ।”

“তিন ঘণ্টা পূর্বে কেবল সে এবং আমি সরাইতে বসিয়াছিলাম,—তখনো আমি সেইরূপ মাতালাবহার ন্যায় ছিলাম । সে বলিয়াছিল, যে আমরা যখন চুরি করিতে বাই, তখন সারাকিং আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলে যে, জলথাবার ঘরে কে? তাহার কথা শুনিয়া আমিই প্রথমে তাহাকে হত্যা করিতে অগ্রসর হই !

“বারনেস্, ইহা অকাটা প্রমাণ বটে । এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমরা মোকদ্দমার কিনারা করিতে পারিব । তুমি আহাঙ্গাদি করিয়া আইস, আমি সন্ধ্যার পরই পূর্বরূপ ছদ্মবেশে তোমার সহিত মিলিত হইব ।”

সন্ধ্যার পরই আমি সরাইতে উপস্থিত হইলাম । তথায় সেই তিনজন লোক ও বারনেস্ বসিয়াছিল । আমি তাহাদের তিনজনের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“সে লোকটা এখনও মাতাল হইয়া আছে না কি ?”

“না, সে সেই হইতে মাতাল হইয়াছিল কিন্তু অন্য বৈকাল হইতে তাহাকে একটু সুস্থ দেখিতেছি ।”

এই সময় বারনেসের সহিত আমার গোপনে কথা বলিবার একটু সুবিধা হইল ! তাহারা কেন্‌ডেল হইতে একখানি গাড়ী আনিয়া সন্ধ্যার পর আহাঙ্গাদি করিয়া বাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল । সরাইয়ের স্বামী তাহাদের বাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, তথা হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে একটি সহরে তাহাদের প্রয়োজন আছে, অন্য রাত্রে সেইখানেই বাইবে । আমি তদন্তেই আমার কার্য্য প্রণালী ঠিক করিয়া সেই চোট ভদ্রলোকটাকে চুপে চুপে বলিলাম, “ভিক্টেপ্লস্, এই ঘরে একবার আসুন, আপনার সহিত আমার একটি কথা আছে ।” তাহার অপর সঙ্গীদ্বয় সেই সময় তালখেলায় মত্ত ছিল, সুতরাং আমার কথা তাহারা কেহই শুনিতে পাইল না । আমি তাহাকে পার্শ্বে একটি ঘরে লইয়া বাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমার ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া পকেট হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া বলিলাম, “ট্রেপল্‌স্, মনে কর, তোমাদের খেলা শেষ হইয়াছে । তুমি কুটোর মতন পোষাক পরিয়া Five Oaks এ তাহার বাড়লের বাকীতে গিয়াছ এবং ভৃত্যকে হত্যা করিয়াছ ?”